পুরাতনী
মহাজাতি
প্রকাশক
কলিকাতা-১২

Approved by the Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI of High and Middle Schools in West Bengal. Vide Notification No Syl.—69-54 dated 1-12-54

পুরাতনী

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীযতীন্দ্র কিশোর চৌধুরী, এম. এ.
প্রাক্তন-অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, এম. এ.
প্রধান শিক্ষক, এগরা উচ্চতর মাধ্যমিক সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর

মহাজাতি প্রকাশক :: কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৫
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৫৫
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৫৬
পঞ্চম সংস্করণ—১৯৫৮
ষষ্ঠ সংস্করণ—১৯৬০
সপ্তম সংস্করণ—১৯৬১
অষ্টম সংস্করণ—১৯৬৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার বসু
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য :
টাঃ ১·৪৪ ন. প.

সূচীপত্র

পুরাতনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান

মানুষের প্রাচীন ইতিহাস আমরা কিভাবে জানতে পেরেছি? দু'দশ বছর আগের ঘটনা যারা চোখে দেখেছে তা'দের কাছ থেকেই জানা যায়। কিন্তু সুদূর অতীতের ঘটনা তো সে ভাবে জানা যায় না। পৃথিবীতে যেদিন প্রথম মানুষের জন্ম হ'য়েছিল, সে-দিন থেকে কত হাজার হাজার বছর গত হয়ে গেছে। আদি মানব যুগে যুগে কত বাধাবিঘ্ন জয় ক'রে, কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, ক্রমে সভ্য হয়ে উঠেছিল। সে কথা তো কেউ লিখে রেখে যায় নি! কারণ, প্রথম অবস্থায় মানুষ ভাল ক'রে কথাই বলতে পারত না, লিখতে-পড়তে তো শিখেছিল তারও বহু যুগ পরে। কাজেই অতি পুরাকালের কথা সরাসরি জানবার কোন উপায় নাই। পণ্ডিতেরা প্রাচীন মানুষের কথা জানতে পেরেছেন অন্য উপায়ে।

প্রায় সব পরিবারেই, হয়তো তোমাদের বাড়ীতেও, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ছবি কিংবা তাঁদের ব্যবহৃত নানা জিনিস-পত্র আছে। তাঁদের তোমরা চোখে দেখনি, কিন্তু তাঁদের ছবি ও জিনিস পত্রগুলি থেকে তোমরা তাঁদের সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পার। ছবি দেখে বুঝতে পার, তাদের চেহারা কেমন ছিল আর তাঁরা কেমন পোশাক প'রতেন। তাঁদের কোন পুঁথিপত্র থাকলে বুঝতে পার, তাঁরা কি ধরণের বই পছন্দ করতেন এবং কি কি ভাষা জানতেন। আর

সংসারখরচের হিসাবের খাতা পাওয়া গেলে সহজেই জেনে নিতে পার, সেকালে জিনিস-পত্রের দাম কি রকম ছিল। এভাবে তোমাদের ঠাকুর্দা বা তাঁদের ঠাকুরর্দাদের জীবন যাত্রা কি রকম ছিল, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের হয়ে যাবে। ঠিক এইভাবেই পুরাণো লোকের তৈরী বা ব্যবহৃত কোন জিনিস-পত্রের সন্ধান পেলে তখনকার জীবনযাত্রা কি রকম ছিল জানতে পারবে। কিন্তু সেগুলি পাওয়ার উপায় কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাটি খুঁড়ে।

মাটি খুঁড়ে ইতিহাসের মাল মসলা উদ্ধার :—এ কালের এক শ্রেণীর পণ্ডিতের কাজই হ'ল পুরাণো যুগের এ সকল জিনিস-পত্র মাটি খুঁড়ে বা গুহা-গহ্বর খুঁজে বের করা। তাঁরা প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে খনন-কার্য চালিয়েছেন। এরকম খনন-কার্য বা অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা মাঠির নীচে, পাহাড়ের গায়ে বা পর্বতের গুহায় পেয়েছেন—সে-যুগের মানুষের কঙ্কাল ও হাড়গোড়, তাদের তৈরী পাথরের যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র, অলঙ্কার ও মাটির বাসন-পত্র। আর পাওয়া গিয়াছে গুহার দেওয়ালে সে-যুগের লোকদের আঁকা সেকালের জীবজন্তু বা শিকারের চিত্র। পণ্ডিতেরা এসব থেকে সে কালের মানুষের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল ও হাড় পরীক্ষা করে ধারণা ক'রতে পেরেছেন তাদের আকৃতি ও গঠন কেমন ছিল, তাদের মাথার খুলি দেখে ব'লতে পেরেছেন তাদের বুদ্ধি কি পরিমাণ ছিল, তারা যে-সব জিনিস-পত্র ব্যবহার ক'রত তা থেকে তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও অনেক কথা জানতে পেরেছেন। আর আদিম মানুষের আঁকা রঙীন ছবিগুলি থেকে তাদের মনের খবরটাও কিছুটা জানা গিয়াছে। এইগুলি হ'ল ইতিহাসের সব চেয়ে প্রাচীন উপাদান।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ :—পণ্ডিতগণ কত প্রাচীন নগর, মন্দির, বাড়ী-ঘর ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে বের ক'রেছেন। মিশর,

পশ্চিম-এশিয়া ও আমাদের দেশের সিন্ধু-উপত্যকায় কত প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিও ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপাদান। আমরা যতটা জানতে চাই ততটা অবশ্য এসব থেকে জানতে পারি নি। কিন্তু যতই আমরা আধুনিক কালের দিকে এগিয়ে আসি, ততই বেশী তথ্য জানতে পারি। পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়ে যে সকল জিনিস-পত্র বের করেন সেগুলির মোটামুটি কাল নির্ণয়ও করতে পারেন। এর ফলে প্রাচীন ইতিহাসে কিসের পর কি ঘটেছে তা আমরা জানতে পারি।

প্রাচীন লিপি :—পুরানো পাথরের দেয়ালে, স্তম্ভের বা মন্দিরের গায়ে, নানা অজানা ভাষার লিপিমালার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে আছে হয়তো প্রাচীন কালের কোন রাজার দিগ্বিজয় কাহিনী, না হয় অশোকের মত কোন রাজার ধর্ম-বাণী প্রচারের কথা, আর না হয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দেব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠার কথা। সেই প্রাচীন কালের লেখার সঙ্গে আজকালকার লেখার কোন মিলই নেই। তবুও পণ্ডিতগণ বছরের পর বছর পরিশ্রম করে এ সকল লেখা পড়তে পেরেছেন এবং এসব থেকে সে-যুগের মানুষের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছেন। কিন্তু দু'এক প্রকার লিপি এনখও পড়তে পারা যায় নি।

প্রাচীন মুদ্রা :—প্রাচীন কালের রাজাদের অনেক মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। এসকল মুদ্রায় রয়েছে সেকালের রাজাদের নাম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন-তারিখও। এগুলিও প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ।

হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি-পত্র :—প্রাচীন কালের লোকদের আরো বেশী খরর পাওয়া যায় তাদের লেখা পুঁথি-পত্র থেকে। সেকালে তো মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। সে যুগের লোকেরা লিখতো তালপাতা, চামড়া বা মাটির টালির উপর। প্রাচীন মিশরের

লোকেরা লিখতো একরকম নলগাছ থেকে তৈরী 'পেপিরাস্' বা কাগজের উপর। আমাদের দেশের বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সবই পাওয়া গেছে হাতের লেখা পুঁথি হ'তে। অন্যান্য দেশেও এরকম প্রাচীন গ্রন্থ আছে, যেমন —আবেস্তা, বাইবেল ইত্যাদি।

প্রাচীন মানুষ সম্বন্ধে আমরা যতটা জানতে চাই, ততটা এখনও জানা যায় নি। কিন্তু মানুষের কৌতূহলের তো সীমা নেই। পণ্ডিতেরা দিনদিনই চেষ্টা করছেন কিভাবে অতীতের বুক থেকে নূতন নূতন কথা বের করা যায়। ফলে ৫০ বছর আগে আমরা যা জানতাম তার চাইতে এখন আমরা বেশী জানতে পারছি, ভবিষ্যতে আরো বেশী জানতে পারব। বড় হয়ে তোমাদের মধ্যেই হয়তো অনেকে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে অতীতের ইতিহাস উদ্ধার করতে সাহায্য করবে।

উপরে যে সকল আবিষ্কার ও উপকরণের কথা বলা হ'ল, সে-সব থেকেই পণ্ডিতগণ প্রাচীন যুগের ইতিহাস গঠন করেছেন। তা'ই এখন তোমাদের বলতে চেষ্টা করব।

অনুশীলনী

১। মানুষের প্রাচীন ইতিহাস জানবার উপায় কি?

২। মাটির তলা থেকে প্রাচীন ইতিহাসের কি কি উপকরণ পাওয়া গিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদি মানব ঃ মানব জাতির বিভিন্ন শাখা বা গোষ্ঠী

পৃথিবীর প্রথম অবস্থা ঃ—এমন একদিন ছিল, যখন পৃথিবীতে মানুষ তো দূরের কথা, কোন প্রাণীরই অস্তিত্ব ছিল না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর বয়স নাকি দু'শ কোটি বছর। কিন্তু কোটি কোটি বছর পর্যন্ত এ পৃথিবী কোন প্রাণীর বাসের উপযোগী ছিল না। তবে, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চেহারা ও আবহাওয়ার অদ্ভুত পরিবর্তন হ'তে থাকে। শেষে একদিন পৃথিবীতে দেখা দেয় প্রাণের স্পন্দন। সেও নাকি প্রায় ৫০ কোটি বছর আগেকার কথা।

প্রাণীর জন্ম ও ক্রমবিকাশ ঃ—পৃথিবী তখন ছিল জলে জলময়। জলের মধ্যেই হয় প্রথম প্রাণের বিকাশ। আগে সৃষ্টি হ'ল জেলির মত কোমল ছোট ছোট এক কোষের জীব। এগুলি ঠিক উদ্ভিদও নয়, প্রাণীও নয়। কিন্তু এগুলি থেকে আরম্ভ করেই লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিকাশের ফলে জীবনের ধারা মানুষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে।

জলজ এই অদ্ভুত প্রাণী থেকে ক্রমে দেখা দিল উদ্ভিদ ও মাছ। মাছ থেকে এল ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতি উভচর প্রাণী। এর পরের ধাপে

লোকেরা লিখতো একরকম নলগাছ থেকে তৈরী 'পেপিরাস্' বা কাগজের উপর। আমাদের দেশের বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সবই পাওয়া গেছে হাতের লেখা পুঁথি হ'তে। অন্যান্য দেশেও এরকম প্রাচীন গ্রন্থ আছে, যেমন —আবেস্তা, বাইবেল ইত্যাদি।

প্রাচীন মানুষ সম্বন্ধে আমরা যতটা জানতে চাই, ততটা এখনও জানা যায় নি। কিন্তু মানুষের কৌতূহলের তো সীমা নেই। পণ্ডিতেরা দিনদিনই চেষ্টা করছেন কিভাবে অতীতের বুক থেকে নূতন নূতন কথা বের করা যায়। ফলে ৫০ বছর আগে আমরা যা জানতাম তার চাইতে এখন আমরা বেশী জানতে পারছি, ভবিষ্যতে আরো বেশী জানতে পারব। বড় হয়ে তোমাদের মধ্যেই হয়তো অনেকে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে অতীতের ইতিহাস উদ্ধার করতে সাহায্য করবে।

উপরে যে সকল আবিষ্কার ও উপকরণের কথা বলা হ'ল, সে-সব থেকেই পণ্ডিতগণ প্রাচীন যুগের ইতিহাস গঠন করেছেন। তা'ই এখন তোমাদের বলতে চেষ্টা করব।

অনুশীলনী

১। মানুষের প্রাচীন ইতিহাস জানবার উপায় কি?

২। মাটির তলা থেকে প্রাচীন ইতিহাসের কি কি উপকরণ পাওয়া গিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদি মানব ঃ মানব জাতির বিভিন্ন শাখা বা গোষ্ঠী

পৃথিবীর প্রথম অবস্থা ঃ—এমন একদিন ছিল, যখন পৃথিবীতে মানুষ তো দূরের কথা, কোন প্রাণীরই অস্তিত্ব ছিল না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর বয়স নাকি দু'শ কোটি বছর। কিন্তু কোটি কোটি বছর পর্যন্ত এ পৃথিবী কোন প্রাণীর বাসের উপযোগী ছিল না। তবে, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চেহারা ও আবহাওয়ার অদ্ভুত পরিবর্তন হ'তে থাকে। শেষে একদিন পৃথিবীতে দেখা দেয় প্রাণের স্পন্দন। সেও নাকি প্রায় ৫০ কোটি বছর আগেকার কথা।

প্রাণীর জন্ম ও ক্রমবিকাশ ঃ—পৃথিবী তখন ছিল জলে জলময়। জলের মধ্যেই হয় প্রথম প্রাণের বিকাশ। আগে সৃষ্টি হ'ল জেলির মত কোমল ছোট ছোট এক কোষের জীব। এগুলি ঠিক উদ্ভিদও নয়, প্রাণীও নয়। কিন্তু এগুলি থেকে আরম্ভ করেই লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিকাশের ফলে জীবনের ধারা মানুষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে।

জলজ এই অদ্ভুত প্রাণী থেকে ক্রমে দেখা দিল উদ্ভিদ ও মাছ। মাছ থেকে এল ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতি উভচর প্রাণী। এর পরের ধাপে

এল সরীসৃপ ; আর সরীসৃপ থেকে আবার জন্মাল পাখী ও স্তন্যপায়ী জীব। সেকালে জীব-জন্তু ছিল অদ্ভুত রকমের। একরকম জীব ছিল হাতীর মতো দেখতে অথচ আকারে হাতীর চেয়ে ঢের বড়। তাদের বলা হত ম্যামথ। পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে
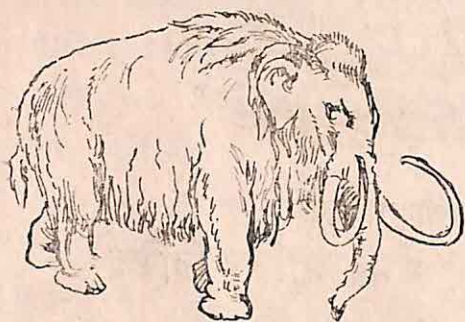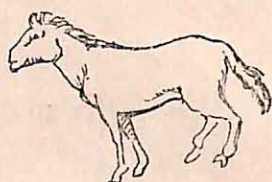
লোমশ ম্যামথ বন্য ঘোড়া

আদিম যুগের অতিকায় ম্যামথ, বাইসন প্রভৃতি জীবগুলি পৃথিবী হ'তে লোপ পেয়েছে। কিন্তু এদের কঙ্কাল মাটির নীচে পাওয়া গিয়েছে। যাদুঘরে এগুলি তোমরা দেখতে পাবে।

মানুষের উৎপত্তি :— অনুমান প্রায় ৫ লক্ষ বছর পূর্বে স্তন্যপায়ী জীব থেকেই পৃথিবীর বুকে দেখা দেয় মানুষ। প্রথমে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিশেষ কোনও পার্থক্যই ছিল না। এক শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীব খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগল। সামনের পা দুটো তারা অনেকটা হাতের মত কাজে লাগাতে আরম্ভ করল এবং ক্রমাগত চেষ্টার ফলে মানুষের মত পেছনের পা দুটোর উপর ভর ক'রে দাঁড়াতে শিখল। এরা দেখতে ছিল ঠিক বানরের মত। কথাটা হয়তো তোমাদের বিশ্বাস হবে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই নর-বানরই নাকি আমাদের পূর্ব-পুরুষ ; এরাই বুদ্ধির বলে অবস্থার উন্নতি ক'রে শেষে সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়েছে।

অর্ধনর ঃ—প্রথম যুগের এই অর্ধ-মানবদের গায়ে ছিল লম্বা লম্বা লোম, কপাল ছিল নীচু, চোয়াল ছিল ঠিক পশুর মত। বনে-জঙ্গলে এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত, ক্ষুধা পেলে খেত ফলমূল আর কচিপাতা। তখন পৃথিবীতে ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিংস্র জানোয়ার। এদের কাছে সেকালের এই মানুষ গুলো ছিল নিতান্ত অসহায়। আত্মরক্ষার জন্য গাছের ডাল ও পাথর ছাড়া তাদের কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না।
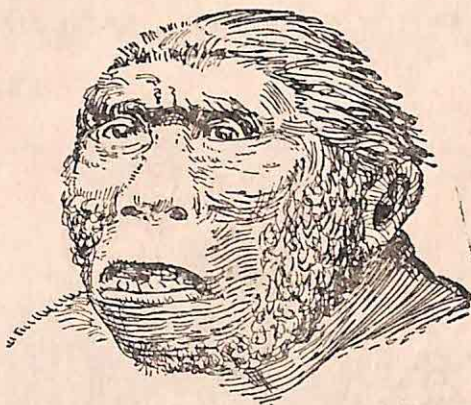
(নর-বানর)

সংখ্যায়ও এরা খুব বেশী ছিল না। ঘর বানাতে তারা জানত না। প্রায় সব সময়েই এরা ঘুরে বেড়াত। তবে কখনো কখনো পাহাড়ের গুহায়, না হয় গাছের ডালে, না হয় হ্রদের ধারে বাসা ক'রে থাকত।

পুরাতন প্রস্তরযুগ ঃ—ক্রমে মানুষ বুদ্ধির জোরে সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠল এবং প্রকৃতিকেও জয় করতে লাগল। তারা ঘষে ঘষে ধারালো করে তৈরী করল অস্ত্র-শস্ত্র—বর্শা, বল্লম, কুড়ুল ইত্যাদি। মানুষ হ'ল শিকারে ওস্তাদ। এসব অস্ত্র দিয়ে তারা তখন বন্য ঘোড়া, ম্যামথ প্রভৃতি জন্তু শিকার করতে লাগল। পশুর কাঁচা মাংস হ'ল তাদের খাদ্য, আর চামড়া হ'ল আবরণ। পণ্ডিতেরা সভ্যতার এই প্রথম যুগের নাম দিয়েছেন পুরাতন প্রস্তরযুগ। এসময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে মানুষের জয়যাত্রা। সে প্রায় ৩৫,০০০ বছর আগেকার কথা।

ক্রমে মানুষ সব বাধা জয় করতে লাগল। এযুগের মানুষের

শ্রেষ্ঠ কীর্তি হ'ল **আগুনের ব্যবহার**। প্রকৃতির উপর এটাই হ'ল মানুষের প্রথম বড় জয়। তারা পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকিতে অথবা কাঠে কাঠে ঘষা-ঘষিতে আগুনের ফুল্‌কি বেরুতে দেখেছিল। তার থেকেই তারা একদিন দু'টুকরো শুকনো কাঠ ঘষে বা চক্‌মকি পাথর
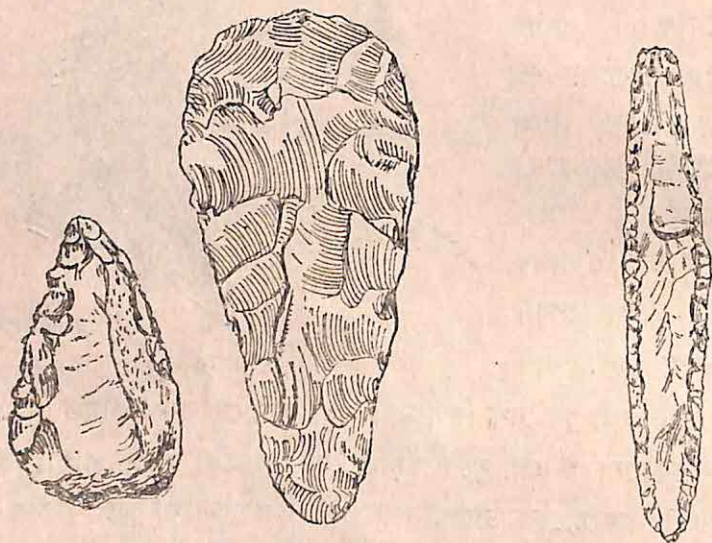
(পুরাতন প্রস্তর যুগ) পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র (নূতন প্রস্তর যুগ)

ঠুকে আগুন জ্বালতে শিখল। সেদিন থেকে শুরু হ'ল এক নূতন যুগ। এই আগুনে তারা তখন মাংস ঝল্‌সে নিয়ে খেতে শিখল। আগুন তাদের শীতের দিনে তাপ দিতে লাগল। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা গুহার সামনে আগুন জ্বেলে রাখত। মৃত পশুর চর্বি দিয়ে প্রদীপ জ্বালতে শিখে তারা অন্ধকারকেও জয় করল।

নূতন প্রস্তর যুগ :—এরপর আরম্ভ হ'ল ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। তখনো মানুষ কোন ধাতুর ব্যবহার শেখেনি, পাথর দিয়েই কাজ চালাত। কিন্তু এযুগের পাথরের হাতিয়ারগুলো ছিল

আগেকার চাইতে অনেকটা মসৃণ, ধারালো ও উন্নত। এজন্য এযুগের নাম দেওয়া হয়েছে **নূতন প্রস্তর যুগ**।

তীর-ধনুকেরও প্রচলন হয়েছিল এযুগে। এযুগের লোকেরা গাছের আঁশ দিয়ে কাপড় বুনতে ও সেলাই করতে জানত। ক্রমে ক্রমে তারা হাত দিয়ে মাটির বাসন-পত্র তৈরি করতে এবং কাঠ দিয়ে ঘর বাঁধতেও শিখল।
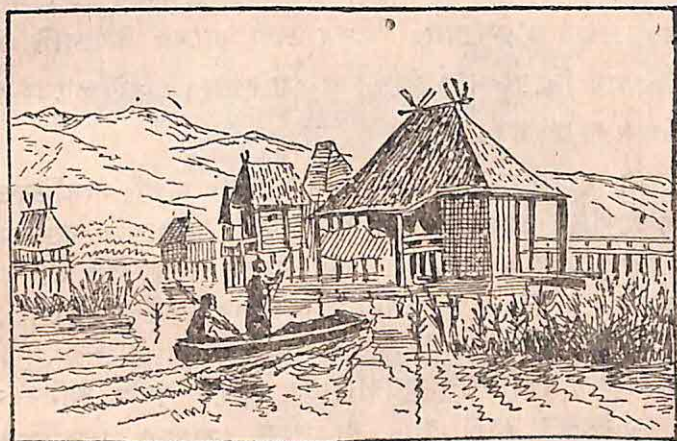
হ্রদের মধ্যে প্রস্তর-যুগের মানুষের বাড়ী ঘর (হ্রদের মধ্যে সে যুগের লোকের একরকম গ্রামের চিহ্ন সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্যস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।)

এযুগের মানুষের প্রধান কীর্তি হ'ল **পশুপালন ও কৃষি**। প্রথমে মানুষ পোষ মানালো কুকুর ও ঘোড়াকে। এরা ছিল শিকারের সহায়। তারপর তারা পুষতে আরম্ভ করল গরু, ভেড়া ও ছাগল। তারা এসব জন্তুর দুধ ও মাংস খেত আর এদের পশম দিয়ে পোশাক ও তাঁবু বুনতো। পশু-পালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের মানুষ যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেছিল। পশুদের উপযোগী ঘাসের অভাব হ'লেই তারা ঐ সব পশুর পিঠে লট্‌বহর চাপিয়ে যেখানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায় সেখানে চলে যেত।

এইভাবে ফলমূল খেয়ে, বন্যজন্তুর মাংস খেয়ে, আদিম মানুষ বাঁচতে লাগল। হঠাৎ তারা একদিন দেখল, তাদেরই খাওয়া ফলের আঁঠি থেকে বেরিয়েছে গাছ। তাদের বুদ্ধি খুলে গেল। এই থেকে শুরু হ'ল মাটি খুঁড়ে ফসল তৈরীর পালা। সবাই এখন আর শিকারের পিছু পিছু ঘুরে না। তারা মাটি খুঁড়ে বীজ বুনে গম, যব প্রভৃতি শস্য ফলাতে লাগল। তাতে ক'রে মানুষের জীবনে ঘটল এক বিরাট পরিবর্তন। একই স্থানে থেকে চাষ-আবাদের ফলে তাদের খাওয়ার ভাবনা ক'মে গেল। তখন তারা চাষের উপযোগী ভাল জায়গা বেছে নিয়ে বসতি স্থাপন আরম্ভ করল। এই ভাবেই গড়ে উঠল **গ্রাম বা জনপদ**।

প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি :—আদিম মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিরও যে বিকাশ হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষ আর পশুর মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, মানুষ কথা বলতে পারে, পশু তা' পারে না। আদিম মানুষ যেদিন কথা বলতে শিখল, সেই দিনই সে পশুর স্তরকে ছাড়িয়ে গেল। প্রথমে মানুষ তার আশে পাশের পাহাড়, নদী, জীব-জন্তু ইত্যাদিকে বুঝবার জন্য পৃথক পৃথক ধ্বনির সৃষ্টি করে। এইরকম নানা ধ্বনি বা শব্দের সাহায্যে তারা অন্যকে নিজের মনোভাব বোঝাতে চেষ্টা করত। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দল এইভাবেই সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ভাষা।

সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগেই মানুষের মনে জেগেছিল শিল্পবোধ। তারা হাতীর দাঁত বা পাথর দিয়ে গড়ত পুতুল ; পাথর ও হাড়ের উপর আঁচড় কেটে কেটে আঁকতো নানারকমের মূর্তি। রঙ্ ছিল এদের অতি প্রিয়। এদের চিত্রিত বহু হাড় ও পাথর পাওয়া গিয়েছে। পুরাতন প্রস্তর যুগের গুহা-মানবেরা ছিল ওস্তাদ শিল্পী। স্পেন দেশের অল্‌তামিরা নামক

হাতীর দাঁতের আঁকা বল্‌গা হরিণ

স্থানে এবং অন্যান্য জায়গায় তা'রা গুহার ভিতরে সেকালের জীব-জন্তুর যে সকল চিত্র এঁকে রেখে গেছে, সেগুলি যেন জীবন্ত—দেখলে অবাক হ'তে হয়।
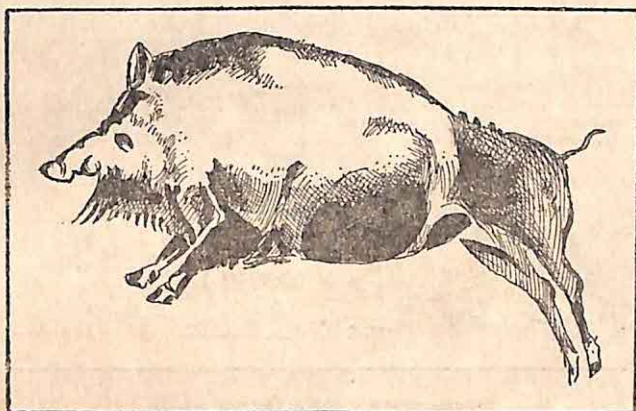
আল্‌তামিরা গুহায় আঁকা শূকরের চিত্র

ক্রমে ক্রমে মানুষের মধ্যে জেগে উঠল ধর্মবোধ। জগৎটা তাদের কাছে ছিল ভয়, বিস্ময় ও রহস্যে ভরা। ঝড়, তুফান, বজ্রের গর্জন—এগুলি তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করত। আবার চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলি তাদের মনে জাগাতো বিস্ময়। তাই এগুলিকে তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। মৃত্যুও তাদের কাছে ছিল একটা পরম রহস্য। তারা মনে করত, সকল মানুষেরই আত্মা আছে এবং মানুষ মরে' গেলেও তার ভাল মন্দ করার ক্ষমতা থাকে। এইভাবে প্রচলিত হয়েছিল মৃতের পূজা বা পিতৃপুরুষের পূজা।

তাম্র ও লৌহ যুগ ঃ—ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রস্তর-যুগের অবসান হয়। তবে পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে নূতন প্রস্তর-

পাথুরে যুগের শেষের দিকের সমাধি
(ইউরোপে এখনো এ রকম অনেক সমাধি দেখা যায়)
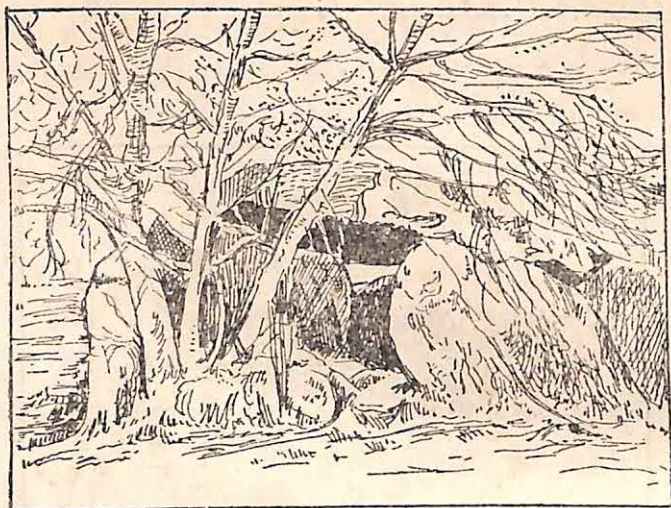
যুগ শেষ হয়নি। প্রায় সাত হাজার বছর পূর্বে এশিয়া ও মিশরেই সর্ব-প্রথম ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়। প্রথমে তামার
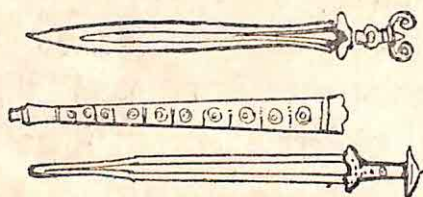
ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র

ব্যবহার হয় ব'লে এযুগকে বলা হয় তাম্র-যুগ। তারপর তামা ও টিন গলিয়ে ব্রোঞ্জের অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরী হতে থাকে। এর হাজার চারেক বছর পরে আরম্ভ হয় লোহার ব্যবহার। এটা হ'ল

লৌহ-যুগ। ধাতুর ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকেই আধুনিক সভ্যতার পথ সহজ হয়েছে।

মানবজাতির বিভিন্ন শাখা বা গোষ্ঠীঃ—পুরাতন প্রস্তর যুগেই মানুষের দল পৃথিবীর নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর ক্রমে তারা যখন চাষবাস শিখলো, তখন নানাস্থানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়ল। সব জায়গার আবহাওয়া তো আর একরকম নয়। বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন জল হাওয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে উহার তারতম্য অনুসারে ক্রমে ক্রমে মানুষের চেহারা ও গায়ের রঙও বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। যদিও পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন যে, সকল মানুষই এক মূল থেকে এসেছে, তবুও আকৃতিগত পার্থক্যের ফলে মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

আজ পৃথিবীর মানুষকে তিনটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়; **যথা—নিগ্রো** বা কালো, **মঙ্গোলীয়** বা পীত, আর **ককেশীয়** বা সাদা।
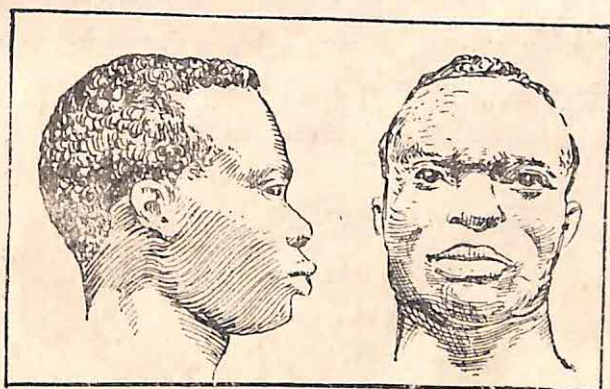
নিগ্রো

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা হল নিগ্রো জাতীয়। এদের চুল উলের মত, রঙ্ কাল, নাক থ্যাব্ড়া, ঠোঁট পুরু। উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় বাস করে পীতকায় মঙ্গোল জাতীয়

লোকেরা। চীনা, জাপানী, তিব্বতী প্রভৃতি জাতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের চুল কাল ও সোজা, চোখ কাল ও তেরচা, চোয়ালের হাড় উঁচু, গায়ের রঙ্ পীতাভ। ককেশীয় বা শ্বেতকায়দের
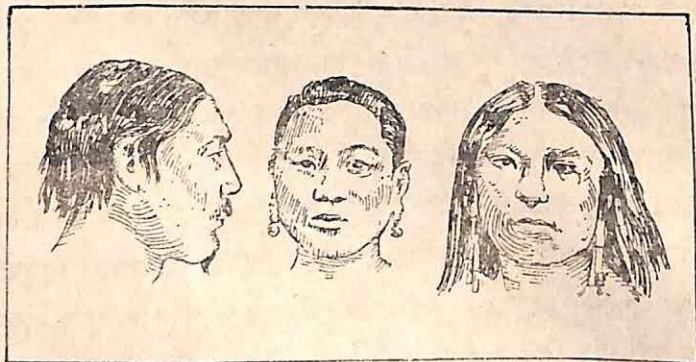
মঙ্গোলীয়

আবার দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—নর্ডিক ও মেডিটারেনিয়ান। ইউরোপ ও পশ্চিম-এশিয়ার উত্তরাংশের লোকেরা নর্ডিক। এদের গায়ের রঙ খুব সাদা। আর নর্ডিক ও নিগ্রোদের মাঝখানে হ'ল মেডিটারেনিয়ান জাতীয় লোক। এরা ঈষৎ কালো। দক্ষিণ
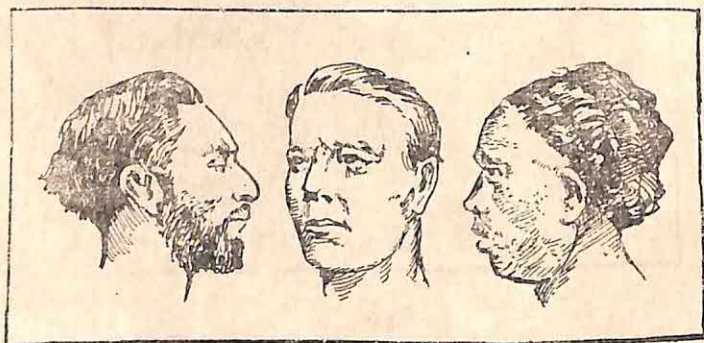
(মাঝের লোকটি নর্ডিক, বাকী দুজন মেডিটারেনিয়ান)

ইউরোপ, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের লোকেরা মেডিটারেনিয়ান জাতীয়।

এই যে তিন জাতীয় লোকের কথা বলা হল, যুগে যুগে এদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ হয়েছে। অমিশ্র জাতি পৃথিবীতে নেই। আমাদের দেশে যেমন নানা জাতীয় লোকের মিশ্রণ হয়েছে, অন্যান্য দেশের বেলায়ও তাই ঘটেছে।

প্রধান প্রধান জাতিগুলি থেকে আবার অনেকগুলি উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, ভাষা অনুসারে অনেক সময়ে জাতির নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন—আর্য, সেমিটিক্ প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি কি ক'রে হল ব'ল দেখি?

২। আদিম যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কি? তাতে সে যুগের মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

৩। পুরাতন প্রস্তর-যুগের মানুষের চেয়ে নূতন প্রস্তর-যুগের মানুষেরা কত দূর উন্নতি করেছিল?

৪। প্রস্তর-যুগের সংস্কৃতি কি রকম ছিল?

৫। মানব জাতির প্রধান শাখাগুলির নাম কর। আমরা ভারতীয়রা কোন্ শাখাভুক্ত?

সময়-সূচক নক্সা

বিঃ দ্রঃ—যেখানে ব্রাকেটের একটার উপর আর একটা উঠে গেছে, সেখানে এক যুগ থেকে অন্য যুগে ক্রমিক প্রবেশের কাল সূচিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন সভ্যতা

সভ্যতার বিকাশ :—তোমরা দেখেছ, হাজার হাজার বছর পর্যন্ত মানুষ ছিল বর্বর। এমন কি নূতন প্রস্তর-যুগেও মানুষ বর্বর ছিল। তারপর এই যুগের শেষের দিকে কৃষির আবিষ্কার মানুষের জীবনে এনে দিল এক বিরাট পরিবর্তন। এখন তারা হয়ে পড়ল স্থায়ী বাসিন্দা। আর স্থায়ী বসবাসের জন্য স্বভাবতই তারা বেছে নিল পৃথিবীর উর্বর সমতল ভূমিগুলি, যার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে বড় বড় নদী। যেমন—নীলনদের দেশ মিশর, টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর মধ্যবর্তী মেসোপোটেমিয়া, ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যকা আর চীনের হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর উপত্যকা। প্রায় ছ'হাজার বছর পূর্বে মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল,—গ'ড়ে উঠেছিল নগর, প্রাসাদ, মন্দির ও সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ। আমাদের দেশে সিন্ধু উপত্যকায় এরকম নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল অতি প্রাচীনকালে।

আদিমকালে ফলমূল সংগ্রহ ও শিকারই ছিল মানুষের একমাত্র কাজ। কিন্তু চাষবাস ক'রে তারা যখন প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করতে লাগল, সমাজ গড়ল, তখন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের গোড়া পত্তন হ'ল। ফলে সমাজে দেখা দিল চাষী ছাড়াও কামার, কুমোর, স্যাকরা, তাঁতি প্রভৃতি নানা পেশার লোক।

এই সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল বিভিন্ন **লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কার**। আদিম মানুষ কথা বলতে শিখেছিল—ভাষার

সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু মনের ভাব মুখের ভাষায় বলা, আর তা লিখতে পারা এ দু'য়ে অনেক তফাত। মানুষ প্রথমে আবিষ্কার করে চিত্র-লিপির, অর্থাৎ প্রথমে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত ছবি দিয়ে। এক-একটি বস্তু বা ভাব বুঝবার জন্য এক-একটি ছবি ব্যবহার করা হ'ল। তার পরের ধাপে প্রত্যেক বস্তু বা অর্থের জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার না ক'রে, তারা এক-একটি ধ্বনির জন্য এক-একটি চিত্র ব্যবহার করতে লাগল, যেমন আমরা আজকাল করে থাকি। এই চিত্রগুলিই হ'ল অক্ষর বা বর্ণমালা।

গৃহস্থ ও যাযাবর :—যখন এক শ্রেণীর লোক মিশর ও মোসোপোটেমিয়ায় স্থায়ীভাবে বাস করছিল, তখন আর এক শ্রেণীর লোক এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। তাদের বলা হয় যাযাবর। এরা খাদ্যের খোঁজে কেবলই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেত। তখন তিনটি প্রধান যাযাবর জাতি ছিল—ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় ছিল **আর্যদল**, পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ছিল **হূণদল**, আর সিরিয়া ও আরবের মরু অঞ্চলে ছিল **সেমেটিক দল**। এইসব ক্ষুধার্ত যাযাবরেরা উর্বর সমতল ভূমিগুলি দখল করার জন্য যুগে যুগে হানা দিয়েছে। এদের আক্রমণের মুখে কত রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছে। পরাজিত জাতির সভ্যতা আত্মসাৎ ক'রে তারা গ'ড়েছে নূতন রাজ্য, নূতন সভ্যতা। মিশর, মেসোপোটেমিয়া, ভারতবর্ষ, চীন—সর্বত্রই এই ধারা চলে এসেছে।

মিশর

উত্তর আফ্রিকার পূর্বপ্রান্তে মিশর দেশ। এর পূর্ব ও পশ্চিম দু'দিকেই মরুভূমি। কিন্তু দেশের ভিতর দিয়ে দু'পাশের জমি প্লাবিত ক'রে বয়ে গেছে নীল নদ। গ্রীষ্মকালে বন্যা এসে এর দুই তীরে

রেখে যায় পলিমাটির সরু আস্তরণ। এই পলিমাটিতে জন্মে উৎকৃষ্ট ফসল। এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত গরম ও শুকনো। নীলনদ না থাকলে পশ্চিমদিক থেকে সাহারা মরুভূমি বহু আগেই মিশরকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ত। এই জন্যই মিশরকে বলে **নীলনদের দান**।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আরবের মরুভূমি, পশ্চিম-এশিয়া ও আফ্রিকার ভিতর থেকে মানুষ এসে উর্বর মিশরে বাস করতে আরম্ভ করে। সেই প্রাচীন যুগেই মিশরীরা নীলনদ থেকে খাল কেটে ও বাঁধ দিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা ক'রে চাষ-আবাদের অসাধারণ উন্নতি করেছিল।

পিরামিডের যুগ :—প্রথমে মিশরীরা একতাবদ্ধ ছিল না। তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বাস করত। প্রত্যেক দলের ছিল নিজস্ব দলপতি বা রাজা, নিজস্ব নগর, নিজস্ব দেবতা। ক্রমে সমগ্র মিশরে গ'ড়ে উঠে দু'টি রাজ্য। নিম্ন মিশর ও উর্ধ্ব মিশর, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ মিশর। তারপর খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে **মেনেস্‌** নামে একজন রাজা এই দুই রাজ্যকে যুক্ত করে এক মিলিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাকালে মিশরের রাজাকে বলা হ'ত **ফারাও**। প্রজারা তাঁহাদের দেবতার মত পূজা করত। মেনেসই ছিলেন মিশরের প্রথম ফারাও। বর্তমান কায়রো সহরের নিকট **মেম্ফিস** নগরী ছিল তার রাজধানী।

এই সময়থেকেপ্রায়তিনহাজার বৎসর ধরে মিশরে অনেকগুলি রাজবংশ রাজত্ব করে। ফারাও মেনেসের কয়েক শ' বছর পরে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালে, মিশর শক্তিশালী হয়ে উঠল। ফারাওরা হাজার হাজার ক্রীতদাস খাটিয়ে বিরাট বিরাট সব পাথরের **পিরামিড** তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। মিশরের বর্তমান রাজধানী কায়রো থেকে কিছু দূরে **গিজে** নামক স্থানে রয়েছে এসব পাথরের বড় বড় স্তূপ। তামার ছেনি দিয়ে বড় বড় পাথরের খণ্ড কেটে এনে

এগুলি তৈরী হয়েছে। ত্রিভুজের মত দেখতে, তিন দিক ঢালু, মাথায় ছোট্ট একটু ছাদ,—অতি নিখুঁত ভাবে পাথরের প পাথর বসিয়ে এগুলি তৈরী হয়েছে। এই পিরামিডগুলি হ'ল মিশরের রাজাদের সমাধি-ঘর।

৪র্থ রাজবংশের প্রথম ফারাও খুফু সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরি করিয়েছিলেন। এই পিরামিডটি সাড়ে চারশ' ফুট উঁচু। পাথরের এরকম বিশাল ইমারত জগতে আর কোথাও নেই। শোনা যায়, এক
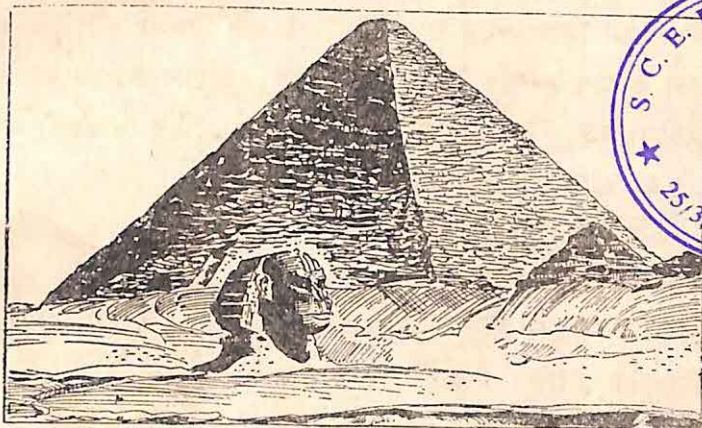
বৃহৎ পিরামিড

লক্ষ লোক কুড়ি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই বিরাট সৌধ তৈরি করেছিল। আমাদের তাজমহলের মত এই পিরামিডও জগতের একটি বিস্ময়ের বস্তু। এইযুগে মিশর রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু দেশের সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল বিরাট বিরাট এইসব পিরামিড তৈরি করতে।

হিক্‌সস্ রাজত্ব :—পিরামিডের যুগের পর রাজধানী হয় **থিবস্**। এই সময়ে মিশরের দুর্দিন উপস্থিত হয়। কয়েকশ' বছর ধ'রে চললো অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। সামন্তেরা হয়ে উঠল স্ব স্ব প্রধান। এই সুযোগে পশ্চিম-এশিয়া থেকে হিক্‌সস্ নামে এক জাতি এসে হানা দিল। এই হিক্‌সস্‌রা ছিল আর্যজাতীয়। তাদের ছিল ঘোড়ায়

টানা রথ আর লোহার অস্ত্র। এই রথের জোরেই তারা মিশরীদের পরাস্ত ক'রে সিংহাসন দখল ক'রে নিল। এরাই প্রথমে মিশরে ঘোড়া আমদানি করে। এর পূর্বে মিশরে ঘোড়া ছিল না। প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করে এরাও দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন মিশরীরা বিদ্রোহ ক'রে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল (খ্রীঃ পূঃ ১৫৮০)।

সাম্রাজ্যের যুদ্ধঃ—হিক্‌সস্‌দের বিতাড়নের পর মিশরে দেখা দিল নূতন জাগরণ, আরম্ভ হল সাম্রাজ্যের যুগ। এ যুগের ফারাওরা এক-একজন ছিলেন মস্ত বড় বীর। তাঁরাও হিক্‌সস্‌দের মত যুদ্ধে ঘোড়া ও রথের ব্যবহার আরম্ভ করলেন। এযুগের ফারাওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন তৃতীয় **থুটমোস**। এই দিগ্বিজয়ী সম্রাট আফ্রিকা ছাড়িয়ে প্যালেষ্টইন, সিরিয়া ও ফিনিশিয়া অধিকার ক'রে এশিয়া মায়নরের প্রান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর নৌ-বাহিনী ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য স্থাপন করে। তিনি তাঁর বিজয়-কাহিনী কর্ণাকের মন্দিরের গায়ে খোদাই করে রেখে গেছেন। শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, মন্দির নির্মাণ ও শিল্পকলায়ও তিনি অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় মিশরের নেপোলিয়ান।

ফারাও তৃতীয় থুটমোস্

তৃতীয় থুটমোসের পরও ফারাওগণ এই বিশাল সাম্রাজ্য কিছু-কাল শাসন করেছিল। কিন্তু তারপরই মিশরের ক্ষমতার ভাঁটা আরম্ভ হল। ভিতরের গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খ্রীঃ পূঃ ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতকে প্রথমে আসিরীয়গণ তারপর পারশিকগণ মিশর দখল ক'রে নিল।

সভ্যতার ভাণ্ডারে মিশরের দান :—প্রাচীন মিশরের সেরা কীর্তি বোধ হয় লিপির আবিষ্কার। গোড়ায় মিশরীরা লিখত ছবির সাহায্যে; তাই মিশরের এই লেখাকে বলা হয় চিত্র-লিপি বা "হাইরোগ্লিফিক।"

মিশরের চিত্রলিপি

এই চিত্রলিপি বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে ক্রমে ২৪টি অক্ষরযুক্ত বর্ণ-মালার আকার নেয়। মিশরীরা 'পেপিরাস' নামক একপ্রকার নল গাছ থেকে কাগজ তৈরি করত। পেপিরাস থেকেই কাগজের নাম হয়েছে 'পেপার'। এই কাগজের উপর মিশরীরা কালি দিয়ে লিখত।

একটি প্রাচীন দেবীমূর্তি

রা-আমন

মিশরের এই চিত্র-লিপি মাত্র শ'খানেক বছর আগে পড়তে পারা গেছে। তার পূর্বে মিশরের ইতিহাস ছিল রহস্যাবৃত। সে

রহস্য উদ্ঘাটন করেন **শামেপালিয়** নামে একজন ফরাসী অধ্যাপক। তিনিই প্রথম বহু পরিশ্রম করে মিশরীয় লিপি পড়তে সক্ষম হন। তারই ফলে মিশরের গৌরবময় প্রাচীন সভ্যতার কথা জানা গেছে।

প্রাচীনকালের অন্যান্য জাতির মত মিশরীরাও ছিল প্রকৃতির উপাসক। আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও নীলনদ থেকে পশুপক্ষী পর্যন্ত অনেক কিছুরই পূজা করত তারা। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্যের দেবতা **'রা'** বা **'আমান-রা'**, আর নীলনদের দেবতা **ওসাইরিস্**। তিনি আবার ছিলেন পরলোকের দেবতা যমরাজ। মৃত্যুর পর পাপপুণ্যের বিচার হ'ত তাঁর কাছে। কতকগুলি দেবতাকে মিশরীরা বেড়াল, কুমীর প্রভৃতি জন্তুর আকারে পূজা করত। এ সকল দেবতাদের জন্য তারা গড়েছিল বিচিত্র কারুকার্যভরা সুন্দর সুন্দর সব মন্দির। এই সব মন্দিরের

একজন ফারাও ওসাইরিসের পূজা করছেন

পুরোহিতদের যেমন ছিল বিদ্যা-বুদ্ধি তেমন ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি। ফারাওগণও তাঁদের খাতির ক'রে চলতেন। এঁদের হাতেই ছিল শিক্ষার ব্যবস্থা। সেকালের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল মন্দিরগুলি।

মিশরীরা পরলোক, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর দেহ রক্ষা না করলে আত্মা ওসাইরিস্ বা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। তাই তারা মৃতদেহ রক্ষার জন্য এক অতি সুন্দর উপায় বার করেছিল। ফারাওদের মৃত্যুর পর দেহ যাতে গ'লে-প'চে না যায় সেজন্য তাদের মৃতদেহ একরকম আরকে ভিজিয়ে রাখা হত। তারপর মৃতদেহটিকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে শবাধারে রাখা হ'ত। এরকম মৃতদেহকে বলে মমি।

মিশরের একজন ফারাও-এর 'মমি'

ফারাওদের এ রকম বহু 'মমি' পাওয়া গেছে। এগুলি বিভিন্ন জাদুঘরে রাখা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত তাদের মুখের চেহারা বিকৃত হয়নি।

প্রাচীন যুগের ফারাওগণ নিজেদের মৃতদেহ রক্ষার জন্যই বিরাট বিরাট পিরামিড সমাধি-মন্দিরগুলি তৈরি করিয়েছিলেন। মিশরী-দের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পরও মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি সবই থাকে। তাই পিরামিডের ভিতরে ফারাওদের মৃতদেহের সঙ্গে সযত্নে রাখা হ'ত তাঁহাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস—গহনাগাটি,

বাসনকোশন, আসবাবপত্র, সাজগোজের জিনিস, আরো কত কি! এছাড়া পিরামিডের ভিতরে সেকালের মিশরের লোকের দৈনন্দিন জীবনের বহু নিখুঁত চিত্রও আঁকা রয়েছে।

পরের যুগের ফারাওগণ আর পিরামিড তৈরি করতেন না। পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কেটে কুঠরী তৈরি ক'রে তার মধ্যে 'মমি' রাখা হত। ১৯২২ সালে ফারাও তুতানখামনের সমাধি খোলা হয়। এই সমাধির ভিতরে পাওয়া গেছে মণিমুক্তা-খচিত ও সোনা-রূপার
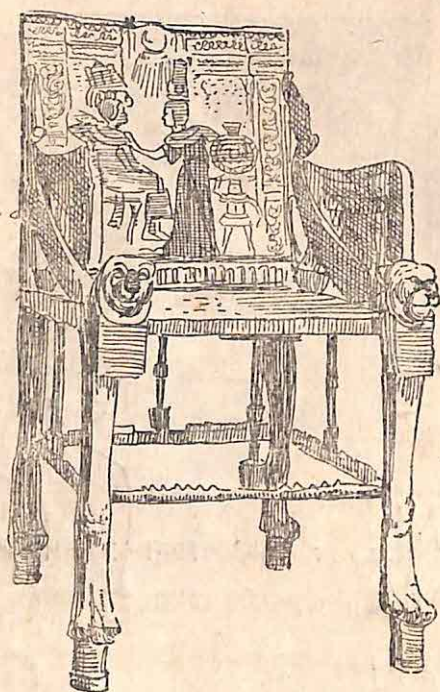
ফারাও তুতান্খামনের সিংহাসন

কাজ করা সিংহাসন, চেয়ার, পালঙ্ক, বাক্স-পেটরা, রথ ও রাজ-পরিচ্ছদ। এগুলি থেকে বেশ বুঝা যায়, প্রাচীন মিশরের কারিগরেরা কত উঁচু-দরের শিল্পী ছিল।

মিশরের শিল্পীরা শুধু পিরামিড নয়, সুন্দর সুন্দর কত মন্দিরও গড়েছিল। মন্দিরগুলির মধ্যমণি ছিল থিব্‌সের নিকট কর্ণাকের বিরাট মন্দির। সাম্রাজ্যের যুগে প্রায় সিকি মাইল লম্বা এই মন্দিরের শোভার তুলনা ছিল না। এই মন্দিরে ১৩৪টি স্তম্ভ ছিল। মন্দিরের কারুকার্য ও স্তম্ভগুলি অতি সুন্দর। এই মন্দির তৈরী হয়েছিল 'আমন' দেবের উদ্দেশ্যে।

কর্ণাকের মন্দিরের বিরাট স্তম্ভশ্রেণী

মিশরীরা ছিল ওস্তাদ কারিগর। ফারাওদের অধীনে আর মন্দিরে মন্দিরে বহু বহু কারিগর নিযুক্ত থাকত। মিশরের কারিগরদের তৈরী সূক্ষ্ম বস্ত্র, রঙ্গীন কাঁচের জিনিস, মীনে করা

নানারকম রঙ্গীন ও পালিশ করা পাত্র, আর চামড়ার কাজ বিদেশে সর্বত্র সমাদর লাভ করত। মিশরীরাই সর্বপ্রথম তৈরি করেছিল
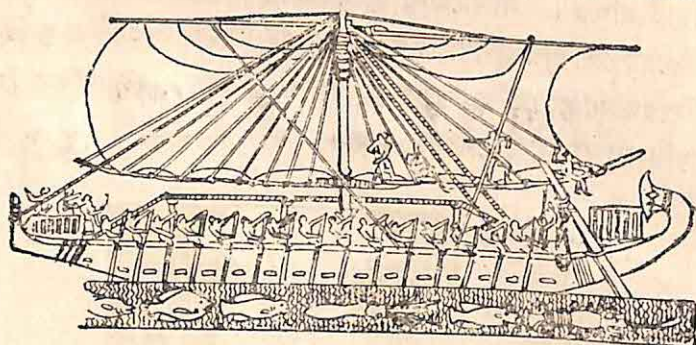
মিশরীয় জাহাজ

সমুদ্রগামী জাহাজ। এ সকল নৌকায় মিশরী বণিকেরা দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ক'রে উন্নত হয়েছিল।

মেসোপোটেমিয়া

এবার তোমাদের আর একটি প্রাচীন দেশের কথা বলব। মিশরের প্রায় আট শ' মাইল পূর্বদিকে, পশ্চিম-এশিয়ায় ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর উপত্যকায় আছে আর একটি উর্বর দেশ। উত্তর দিকে আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে এসে এ-দুটি নদী মরুভূমি ভেদ করে পারশ্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই দুই নদীর মধ্যে যে দেশ তাকে আজকাল আমরা বলি ইরাক, পূর্বে গ্রীকরা ব'লত **মেসোপোটেমিয়া**, অর্থাৎ নদী-ঘেরা দেশ। মিশরের মতই উর্বর এ দেশ, কিন্তু মিশরের মত এ দেশ প্রাকৃতিক বাধা দ্বারা সুরক্ষিত নয়। সেই প্রাচীনযুগে এর উত্তর ও পূর্ব দিকে বাস করত পার্বত্যজাতিগুলি আর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিচরণ করত যাযাবর সেমিটিক জাতি। এদের কাছে এই উর্বর দেশটা ছিল পরম লোভনীয়। তাই হাজার হাজার বছর ধ'রে এদের মধ্যে লড়াই চলেছে এ দেশ অধিকারের জন্য।

সুমের ও সুমেরীয় সভ্যতা :—খ্রীস্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে মিশরের মত এই দেশেও গ'ড়ে উঠেছিল আর একটি সভ্যতা। যারা এই সভ্যতার জনক তাদের বলা হয় **সুমেরীয়**। সুমেরীয়গণ এই দোয়াবের দক্ষিণাংশে বাস করত বলে ঐ অংশের নাম হয়েছিল **সুমের** বা **সুমেরিয়া**। সুমেরীয়দের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। হয়তো প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তারা মুখ ও মাথার চুল কামিয়ে ফেলত, আর পশমের খাটো জামা প'রত।

কৃষিকার্যে তারা ছিল মিশরীয়দের মতই নিপুণ। কিন্তু সুমের ছিল শুষ্ক দেশ। শীতকালে সামান্য বৃষ্টি হ'ত। তা ছাড়া ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসে বন্যা দেখা দিত সংহার-মূর্তিতে। তাই এই বন্যার জল নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তারা নদীর তীরে স্থানে স্থানে উঁচু বাঁধ তৈরি করেছিল। অসংখ্য খাল কেটে জমিতে সেচের ব্যবস্থা ক'রে তারা প্রচুর শস্য জন্মাতো। তারা গরু, গাধা, ছাগল ও মেষ পুষতো, কিন্তু ঘোড়া ছিল না তাদের।

সুমেরীয় পুরোহিত
(খ্রীঃ পূঃ ৩০০০)

গোড়ার দিকে সুমেরিয়ার এক-একটি ছোট শহর ছিল এক একটি স্বাধীন রাজ্য। প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন পুরোহিত। একদিকে তিনি রাজা, আবার অন্য দিকে নগরের দেবতার পূজারী। প্রত্যেক নগরের ছিল নিজস্ব দেবতা। রোদে শুকানো ইট দিয়ে তাঁরা তৈরি করতেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির। এগুলি দেখতে ছিল খুব উঁচু স্তম্ভের মত। সুমেরীয় নগরগুলির মধ্যে প্রধান ছিল **কিশ, উর ও নিপ্পুর**। এই

সকল ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ চ'লত। সুমেরীয়গণ ছিল শক্তিমান জাতি। সুমেরীয় সৈন্যেরা কুঠার, লম্বা বর্শা ও ঢাল নিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত। তারা মাথায় প'রত তামার শিরস্ত্রাণ। ইতিহাসের সব চেয়ে প্রাচীন সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠেছিল এই সুমেরিয়ায়।
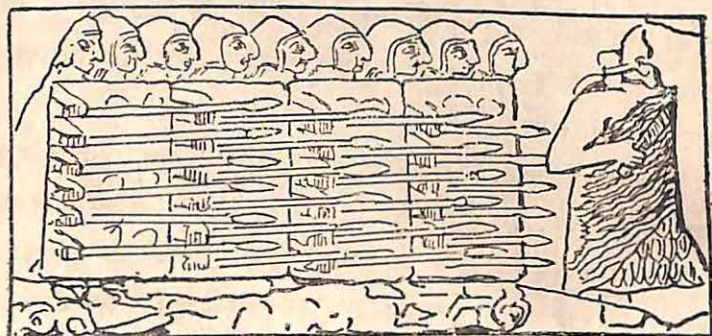
সারিবদ্ধ সুমেরীয় সৈন্য (প্রাচীন পাথরে খোদাই করা)

অতি প্রাচীন কালেই তারা নৌকা গ'ড়তে শিখেছিল। সুমেরীয় বণিকেরা দূর দূর দেশে বাণিজ্য ক'রতে যেত। এমনকি সুদূর মিশরে আর ভারতবর্ষের সিন্ধুতীরেও তাহাদের গতিবিধি ছিল। সুমেরিয়ার লোকেরা পশমের কাপড় বুনত আর প্রচুর বার্লি ও গম উৎপন্ন করত। এই সকল পণ্যের বিনিময়ে বিদেশ থেকে তারা আমদানি ক'রত কাঠ, ধাতুদ্রব্য, পাথর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

মিশরীদের মত সুমেরীয়গণও এক রকম লিপির আবিষ্কার

মেসোপোটেমিয়ার কীলক-লিপি

করেছিল। মিশরীরা লিখত কালি-কলম দিয়ে পেপিরাসের উপর। সুমের দেশে পেপিরাস্ মিলত না। কিন্তু সেখানকার পলিমাটি ছিল খুব নরম। সুমেরীয় লিপিকারগণ এই মাটি দিয়ে শ্লেটের মত

ফলক বা টালি তৈরি ক'রত। এই নরম টালির উপর তারা কাঠি দিয়ে লিখত। তারপর সেগুলি রোদে শুকিয়ে নিত। কাঁচা ফলকে লেখা এই চিহ্নগুলির চেহারা হ'ত কীলক বা গোঁজের মত। এজন্য

পাথরে খোদাই করা এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে রাজা হামুরাবি সূর্যদেবের নিকট থেকে তাঁর সংহিতা গ্রহণ করছেন

সুমেরীয় লিপিকে বলা হয় কীলক্-লিপি। লিপি-খচিত এরকম বহু মাটির টালি পাওয়া গিয়াছে এবং এই লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছিল।

বাবিলনীয় সাম্রাজ্য :—মেসোপোটেমিয়ার ইতিহাস অবিরাম

যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে পশ্চিম দিকে যাযাবর সেমিটিক্‌রা এত প্রবল হ'য়ে উঠল যে সুমেরীয়গণ আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। কিছুকাল পরে একটি সেমিটিক্ দল ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ক্ষুদ্র **বাবিলন** সহরে একটি রাজ্যের পত্তন ক'রল। এই বাবিলনের রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **হামুরাবি**। খ্রীঃ পূঃ ২১০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে সমগ্র মেসোপোটেমিয়া জয় ক'রে তিনি বাবিলনীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হামুরাবি কীর্তিমান সম্রাট্ ছিলেন। রাজ্য-শাসনেও তিনি সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। যে কীর্তির জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছেন তা' হ'ল তাঁর আইন-সংগ্রহ। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম আইন লিপিবদ্ধ করেন। আট ফুট উঁচু একটা পাথরের ফলকে তিনি তাঁর সংহিতা বা আইন খোদাই করেন এবং বাবিলনের **মারদুক** দেবের মন্দিরের গায়ে তা গেঁথে রাখেন। প্রায় ৫০ বছর পূর্বে একজন ফরাসী পণ্ডিত এই ফলকটি আবিষ্কার করেন। প্যারী নগরীর যাদুঘরে এটি রাখা হয়েছে। সম্রাট্ হামুরাবি যে সুশাসক ছিলেন, এই সংহিতা থেকে আমরা তার প্রমাণ পাই।

আসিরীয় সাম্রাজ্য ঃ—এর কয়েক শ' বছর পর বাবিলনসহ সমগ্র মেসোপোটেমিয়ায় আবার আর এক সেমিটিক্ জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। এদের বলা হয় **আসিরীয় জাতি**। তারা লম্বা দাড়ি ও চুল রাখত, লম্বা টুপি ও ঝুলানো জামা পরত। উত্তর দিকে টাইগ্রীস্ নদীর তীরে **অসুর** নগর ছিল এদের বাসস্থান। অসুর নগরের কিছু উত্তরে **নিনেভে** ছিল তাদের আর একটি শহর। পরে আসিরীয়দের রাজধানী হয়েছিল এই **নিনেভে**।

সে যুগটা **ছিল** লড়াইয়ের যুগ। প্রতিবেশী দুর্ধর্ষ জাতিগুলির সঙ্গে লড়তে লড়তে আসিরীয়গণ হয়ে উঠেছিল যোদ্ধার জাত।

প্রায় এই সময়েই যুদ্ধে লোহার অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই নূতন অস্ত্রের জোরে আসিরীয়গণ দুর্জয় হ'য়ে উঠল। বর্শাধারী পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ আর ঘোড়ায় টানা রথ—এই সব নিয়ে ছিল তাদের বাহিনী। তাদের মত নৃশংস যোদ্ধার জাত সেকালে

একজন আসিরীয় রাজা ও তাঁর মন্ত্রী

পৃথিবীতে আর ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন ও পীড়ন ছিল তাদের কাছে একটা আমোদ। বিজিত শত্রুর প্রতি এতটুকু দয়া তারা দেখাত না।

কিন্তু একথা স্বীকার ক'রতে হবে যে, অসুর সম্রাটরা রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ক'রে একটা উন্নত সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৭২০ থেকে ৬২০—এই একশ' বছরই হ'ল আসিরীয় সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ। এ সময়ে তাদের সাম্রাজ্য বাবিলন থেকে
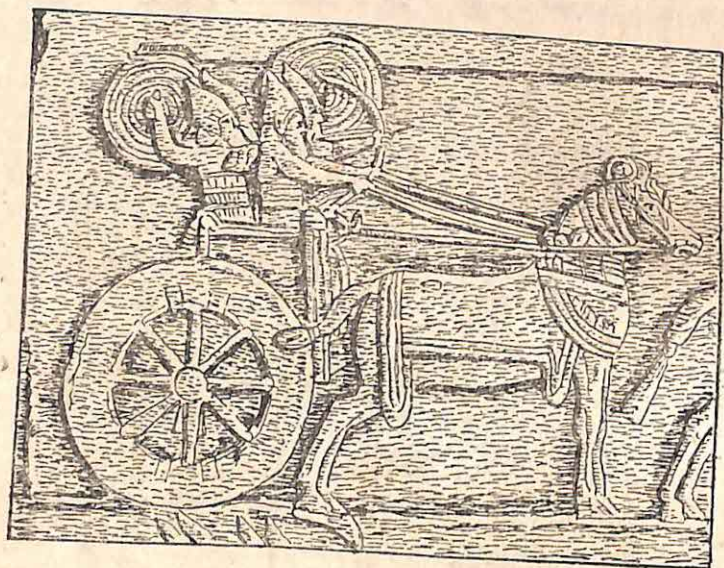
আসিরীয়দের যুদ্ধের রথ

সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে বিস্তৃত হয়েছিল। শেষ শ্রেষ্ঠ অসুর সম্রাট্ ছিলেন **অসুরবানিপাল** (খ্রীঃ পূঃ ৬৬৮—৬২৬)। তিনিই মিশর জয় করেন। এত বড় সাম্রাজ্য পূর্বে আর কখনো হয়নি। অধিকাংশ অসুর সম্রাটই বিদ্যাচর্চার ধার ধারতেন না। সম্রাট্ অসুরবানিপাল কিন্তু শুধু রাজ্যজয় নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না। বিদ্যাচর্চায়ও তাঁর উৎসাহ ছিল। তাঁর সবচেয়ে গর্বের বস্তু ছিল তাঁর বিরাট গ্রন্থাগার। মাটির ফলকে লেখা সুমের ও বাবিলনের ভাল ভাল সব রচনা সংগ্রহ করে তিনি তাঁর গ্রন্থাগারে রেখেছিলেন। নিনেভে নগরে এই

প্রাচীন গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং একরকম বাইশ হাজার মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। এই ফলকগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

সম্রাট্ অস্থুরবানিপালের মৃত্যুর পর বাবিলনের সেমিটিক্ জাতীয় কালদীয়গণ এবং আর্য জাতীয় মিডীয়গণ একযোগে আক্রমণ ক'রে আসিরীয় সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল। রাজধানী নিনেভে ধ্বংস হ'ল (খ্রীঃ পূঃ ৬১২)। তরবারির জোরে যে সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিল, তরবারির দ্বারাই তার অবসান হ'ল।

নূতন বাবিলনীয় সাম্রাজ্যঃ—নিনেভের পতনের কিছুকাল আগে কালদীয়গণ বাবিলন অধিকার করেছিল। তাদের নামাম্নুসারে বাবিলনীয়ার দক্ষিণাংশের নাম হয়েছিল কালদিয়া। এই কালদীয়-গণ প্রাচীন বাবিলনকে রাজধানী ক'রে নূতন বাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রল। **নেবুকাদনেজার** ছিলেন এই রাজ-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তিনি চল্লিশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করেন এবং বাবিলন নগরীকে নূতন ক'রে গড়ে তোলেন। তাঁর সময়ে বাবিলনের জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির তুলনা ছিল না। বাবিলনই ছিল সেকালের বাণিজ্যকেন্দ্র। নগরের প্রাকার ছিল প্রায় দশ মাইল লম্বা আর নব্বই ফুট চওড়া। সকলের উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল **মারডুক দেবের মন্দির**। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়ের বস্তু ছিল রাজপ্রাসাদটি। আর এই প্রাসাদের উপরে সম্রাট নেবুকাদনেজার স্তম্ভের উপর দু'-তিন তলা এক বাগান তৈরী করিয়েছিলেন। দূর থেকে দেখলে মনে হ'ত যেন বাগানগুলি একটার পর একটা শূন্যে ঝুলছে। একেই বলে বাবিলনের শূন্যোদ্যান। নেবুকাদনেজারের রাণী ছিলেন পার্বত্য মিডিয়া দেশের রাজকন্যা। বাবিলনে নিজদেশের মত পাহাড়ের দৃশ্য না দেখে রাণীর প্রাণ নাকি হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাঁকে তুষ্ট করবার জন্যই নেবুকাদনেজার তৈরি করেছিলেন এই সু-উচ্চ শূন্যোদ্যান।

প্রাচীন গ্রীক্‌গণ এই শূন্যোদ্যানকে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি আশ্চর্য ব'লে ঘোষণা করেছিলেন।

সম্রাট্ নেবুকাদনেজারের মৃত্যুর পর বাবিলনের এই গৌরবের অবসান হল। খ্রীঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে পারশ্য সম্রাট **সাইরাস্** বাবিলন অধিকার করেন।

বিজ্ঞানে বাবিলনের দানঃ—প্রায় তিন হাজার বছর ধ'রে বাবিলন সভ্যজগতে গুরুর আসন দখল ক'রে ছিল। বাবিলনের বিজ্ঞানীরা গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ ক'রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করেছিলেন। তাঁরা পাঁচটি গ্রহ আবিষ্কার করেন। আমরা এগুলিকে বলি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। তাঁরা রাশি-চক্রের বারটি চিহ্ন স্থির করেন, এমন কি নক্ষত্রলোকের একটা মানচিত্রও তৈরি করেন। তাঁরাই প্রথম দিনকে ঘণ্টায় ও ঘণ্টাকে মিনিটে ভাগ করেন। চাঁদের গতিবিধি দেখে তাঁরা মাসের হিসাব করতেন।

সিন্ধুসভ্যতা

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারঃ—খ্রীস্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায়ও গড়ে উঠেছিল এক অতি প্রাচীন সভ্যতা। ত্রিশ বছর আগেও কিন্তু লোকের একথা জানা ছিল না। এতদিন ঐতিহাসিকেরা মনে ক'রতেন যে, আনুমানিক চার হাজার বছর পূর্বে আর্য জাতির আগমনের পর থেকেই ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভ। কিন্তু কয়েক বছর আগে সিন্ধু-উপত্যকায় **মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পা** নামক স্থানে এক সু-প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় এ ধারণা উল্টে গেছে। মহেঞ্জোদড়ো হ'ল সিন্ধুদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধুনদীর তীরে, আর তার ৪০০ মাইল উত্তরে পাঞ্জাবের ইরাবতী নদীর তীরে হ'ল হরপ্পা। ১৯২১-২২ সালে বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহেঞ্জোদড়োতে একটি বৌদ্ধস্তূপ খনন করতে গিয়ে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তার কিছু আগে হরপ্পায়ও এরকম আর একটি আবিষ্কার হয়। এসব থেকে প্রমাণ হয়েছে, আর্যদের আগমনের বহু আগে থেকেই এদেশে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা চ'লে আসছিল।

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত একটি মূর্তি

সিন্ধু-নদের উপত্যকায় মাটি খুঁড়ে এই যে লুপ্ত প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাকেই বলা হয় **সিন্ধুসভ্যতা**। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন সুমেরীয়গণ আর সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্য লোকেরা একই জাতি বা সমজাতীয়; কারণ দু'জায়গাই মাটির তলা থেকে যে সকল জিনিস বের হয়েছে, সেগুলির মধ্যে খুবই সাদৃশ্য রয়েছে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় অনেক শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। এগুলির উপর ছবির মত এক রকম লিপি খোদাই করা আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই লেখা এখনও পড়া যায়নি। তাই তখনকার সিন্ধু উপত্যকার ইতিহাস কিছু জানা যায়নি। তবে এই ধ্বংসাবশেষ থেকে সে সময়কার লোকের জীবন-যাত্রার মোটামুটি একটা ছবি আমরা পাই।

মহেঞ্জোদড়োর শীলমোহর

মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা ঃ মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা। এই নগরের পরিকল্পনা ছিল অনেকটা আধুনিক ধরনের। নগরের রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত; রাস্তার দু'ধারে একতলা, দুতলা, এমন কি তে-তলা চকমিলানো বাড়ীর চিহ্ন রয়েছে। বাড়ীগুলি সবই শক্ত পোড়া ইটের তৈরী। প্রত্যেক বাড়ীতে ছিল কূপ, স্নানের ঘর ও জল নিকাশের চমৎকার ব্যবস্থা। রাস্তার দু'ধারে ছিল ঠিক আজকালকার মত ঢাকা নর্দমা। মহেঞ্জোদড়োর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হ'ল সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নগরের মধ্যে একটি বিরাট স্নানাগার। আজকালকার বহু স্নানাগার অপেক্ষা এটি সুন্দর। এ থেকে বেশ বুঝা যায়, মহেঞ্জোদড়োর নাগরিক জীবন কত উন্নত ছিল।

তখন কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল সিন্ধু-উপত্যকার অধিকাংশ লোকের পেশা। চাষীরা বার্লি, গম ও কার্পাসের চাষ করত। এস্থানে

নানা জীব-জন্তুর ছবি, নর-নারীর মূর্তি, বিচিত্র মাটির পাত্র, শীল-মোহর, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাদ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। এগুলি শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শীলমোহরগুলির উপর ষাঁড়, মোষ, বাইসন প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর ছবি রয়েছে। এগুলি এমন জীবন্ত যে
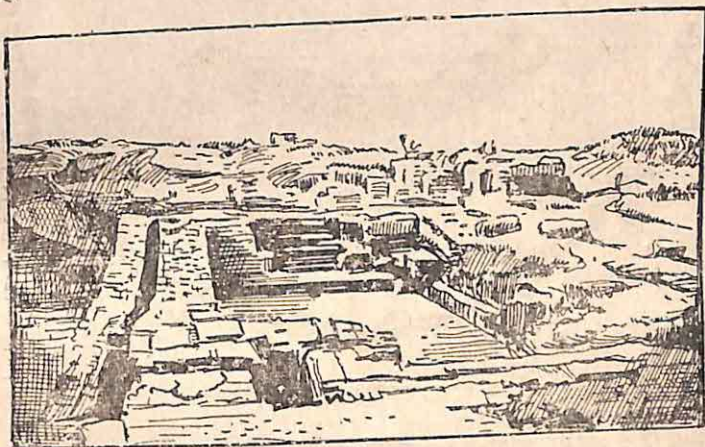
মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার

সে-যুগে অন্য কোথাও তার তুলনা মিলে না। একমাত্র লোহা ছাড়া সোনা, রূপা প্রভৃতি প্রায় সব ধাতুরই ব্যবহার তারা জানত। জীব-জন্তুর মধ্যে ঘোড়া তাদের অজ্ঞাত ছিল। মেয়েরা পশম ও তূলার কাপড় বুনত। ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর সুন্দর নানারকম খেলনাও তারা তৈরি ক'রত।

কোন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, কিন্তু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধুবাসীরা জগন্মাতা বা দুর্গা ও শিবের পূজা করত ব'লে মনে হয়। বোধ হয় তখন গাছপালা ও জীবজন্তুর পূজারও প্রচলন ছিল।

অনেকে মনে করেন, সিন্ধুবাসী এই সভ্য জাতি দ্রাবিড়দেরই জ্ঞাতি; কারণ দুই সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া

যায়। আর্যদের ভারতে আগমনকালে এই দ্রাবিড়গণই ভারতে বাস ক'রছিল। কি ভাবে যে এত বড় সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংশ হয়েছিল, তা
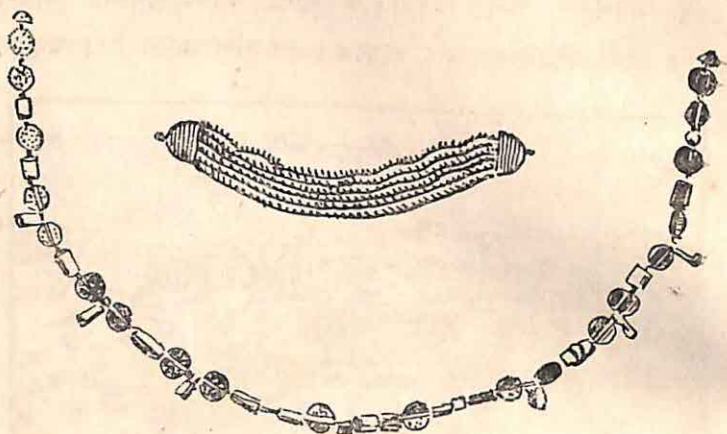
মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত গহণাপত্র

এখনও ঠিক জানা যায়নি। তবে সুদূর অতীতের এই সভ্যতার সঙ্গে যে বর্তমান হিন্দু-সভ্যতার যোগ রয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

চীন

মিশর, সুমের ও ভারতবর্ষের মত চীনও অতি প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, কিংবা তারও আগে চীনজাতির পূর্ব পুরুষেরা খুব সম্ভব মধ্য-এশিয়া থেকে গিয়ে চীন আক্রমণ করেছিল। হোয়াং হো বা পীত নদীর উপত্যকায় তারা প্রথম ঘর বেঁধেছিল। কয়েক শ' বছরের মধ্যে ক্রমে তারা চীন দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাঁচজন আদর্শ রাজা :—চীন দেশের আদি কালের রাজাদের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার কিছুটা হয়তো সত্য, বাকিটা কল্পনা। তাঁরা ছিলেন আমাদের দেশের রাজা দশরথ, রামচন্দ্র,

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির মত সে দেশের পৌরাণিক যুগের রাজা। চীনের পুরাকাহিনীতে পাঁচজন আদর্শ রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁরাই নাকি চীনাদের নানা বিদ্যা শিখিয়ে সভ্য করে তুলেছিলেন। তাঁরাই তাদের শিখিয়েছিলেন যন্ত্রাদির সাহায্যে গান করতে, ছবি আঁকতে, লিখতে, জাল দিয়ে মাছ ধরতে, আর রেশমগুটি থেকে সুতো বের ক'রে রেশমী কাপড় বুনতে। একজন রাজা চীনকে দিয়েছিলেন চুম্বক, প্রথম ইটের তৈরী ইমারত আর মান-মন্দির। আর একজন রাজা নাকি বনবাদাড় পরিষ্কার ক'রে বুনো জানোয়ার তাড়িয়ে, নদীর বন্যা রোধ ক'রে, চাষবাসের উন্নতি করেছিলেন।

শাঙ্ অথবা ঈন রাজবংশ (খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০-১১২৫) ঃ—এই প্রথম পাঁচজন রাজার রাজত্বের কতকগুলি রাজবংশ পরপর রাজত্ব করেন। প্রথম যে রাজবংশের রাজত্ব সম্বন্ধে আমরা নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই, সেটা হ'ল **শাঙ্** অথবা **ঈন** রাজবংশ। খ্রীস্টের প্রায় ১৮০০ বছর পূর্বে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পীত নদীর উভয় তীর জুড়ে ছিল এদের রাজ্য। পীত নদীর উপত্যকায় ঈন রাজাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। তার থেকে সেকালের চীনের লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। এখানে যে সমস্ত লিপির আবিষ্কার হয়েছে তার অধিকাংশই হ'ল এক রকম কচ্ছপের খোলার উপর অথবা জীব-জন্তুর হাড়ের উপর খোদাই করা। সেকালে চীনাদের কাছে কচ্ছপের খোলার বিশেষ একটা মাহাত্ম্য ছিল। এই কচ্ছপের খোলার উপরকার রেখা দেখে তারা ভবিষ্যৎ জানতে চেষ্টা করত। এসব ছাড়া পাওয়া গিয়েছে তীর ও বর্শার সাহায্যে শিকারের সুন্দর সুন্দর খোদিত চিত্র, আর নানা জীব-জন্তুর চিত্র। ব্রোঞ্জের নানারকম পূজার পাত্র এবং মীনা করা ও চিত্রবিচিত্র কত মাটির বাসনকোসন পাওয়া গিয়েছে। সেকালের চীনা কারিগরেরা যে কত বড় ওস্তাদ শিল্পী ছিল, তা' এগুলি দেখে বেশ বুঝা যায়।

সেকালের চীনারা অনেক দেবতার পূজা ক'রত। এ সকল দেবতার পূজাকে এক হিসাবে প্রকৃতির উপাসনাও বলা যেতে পারে। তারা প্রকৃতির মধ্যে নানা শক্তির বিকাশ দেখত। এঁরা হ'লেন ঝড়, বৃষ্টি, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারা, পর্বত, নদী প্রভৃতির দেবতা। সকল দেবতার উপরে হ'লেন 'তিয়েন'—আমরা বলি ঈশ্বর। এ সকল দেবতার পূজা ছাড়া চীনের লোকেরা নিজ নিজ ঘরে পূর্ব-পুরুষের পূজা ক'রত। তারা মৃত পূর্ব পুরুষদের দেবতা ব'লে মনে ক'রত।

চৌ-রাজবংশ (খ্রীঃ পূঃ ১১২৫-২২০)—ঈন্ বংশ ছ'শ পঁচিশ বছর রাজত্ব করার পর প্রজারা বিদ্রোহ ক'রে তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করে। তারপর রাজত্ব করে **চৌ-বংশ**। চৌ-রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। এই যুগে ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে উন্নতি আরম্ভ হয়েছিল। চৌ-রাজবংশের রাজত্বকালে তাঁদের রাজ্য দক্ষিণে ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চৌ-রাজারা রাজ্যের সামন্তগণকে তাদের জমিদারির আয়তন অনুসারে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। জমিদারির এলাকায় যারা বাস করত সেই সব প্রজাগণকে সর্বদা প্রভুর আদেশ মানতে হ'ত। তাদের অনেক মেহনৎ করতে হ'ত। মালিকের জমি চাষ-আবাদ করা, বিনা মজুরিতে তাঁর জন্য কাঠ কাটা, তাঁর বাড়ীতে মাছ-মাংস ভেট দেওয়া ইত্যাদি কাজ ছিল নিত্য-নিয়মিত। মালিকের পোশাক-পরিচ্ছদও প্রজাদেরই যোগান দিতে হ'ত। এই সব ক'রে প্রত্যেক প্রজা এক এক খণ্ড জমি পেত। কুড়ি বছর বয়সে একটা লোক জমি পেত, ষাট বছর পর্যন্ত সেই জমি ভোগ করত। ষাট বছর বয়সের বেশী বেঁচে থাকলে তাকে আর কাজ ক'রতে হ'ত না—সে পেন্‌সন্ ভোগ ক'রত।

প্রথম আড়াই শ' বছর পর্যন্ত চৌ-রাজারা পরাক্রমশালী ছিলেন এবং সামন্তদের সংযত রেখেছিলেন। সামন্তরা রাজাকে কর দিতেন

আর যুদ্ধের সময় সৈন্যাদি নিয়ে রাজার সাহায্য করতে আসতেন। রাজ-দরবারে তাঁদের নিয়মিত হাজিরা দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চাষ-বাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা জানাতে হ'ত। রাজাও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সামন্তদের রাজ্য পরিদর্শন করতে যেতেন। তখন দুষ্ট সামন্তেরা পেতেন শাস্তি আর অনুগত সামন্তেরা পেতেন পুরস্কার।

কিন্তু ক্রমে চৌ-রাজারা রাজার কর্তব্য ভুলে গেলেন। কেন্দ্রীয় রাজ-শক্তি ভেঙ্গে প'ড়ল। সামন্ত রাজারা স্বাধীন হ'য়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু ক'রে দিলেন। তখনও চৌ-রাজত্ব চলছে কিন্তু সে নামে মাত্র। খৃঃ পূঃ অষ্টম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দেশের মধ্যে চ'ললো এই বিশৃঙ্খলা।

চীনের এই সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে অনেক অত্যাচার অনাচার ঘটেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাংস্কৃতিক উন্নতিও এসময়ে অনেক হয়েছে। সামন্তরাজারা সকলেই জ্ঞানী-গুণীর আদর করতেন। কার সভায় কতজন পণ্ডিত লোক আছেন এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে চ'লতো প্রতিযোগিতা। ফলে প্রত্যেক রাজসভাই হ'য়ে উঠেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক-একটি কেন্দ্র। মহাজ্ঞানী **কন্‌ফুসিয়স্** ছিলেন এই যুগেরই লোক। তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ থেকে আমরা সেকালের চীন সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

সময়-সূচক নক্সা

খৃঃ পূঃ	মিশর		মেসোপোটেমিয়া		ভারত	চীন
৪০০০		তামার আবিষ্কার চিত্রলিপি	[illegible]	সুমেরীয় গণ কীলক লিপি		
৩৭০০		ফারাও মেনেস				পৌরাণিক যুগ (আদর্শ সম্রাটগণ)
৩৪০০	[illegible] যুগ	প্রথম অক্ষর মালা				
৩১০০		ফারাও খুফু		সেমিটিক বিজয়	সিন্ধু সভ্যতা	
২৮০০	[illegible] যুগ					
২৫০০						
২২০০			[illegible]	হাম্মুরাবি		
১৯০০		হিকসো শাসনের অবসান ৩য় থুটমোস তুতানখামেন				শাং রাজবংশ
১৬০০	সাম্রাজ্যের যুগ			আসিরীয়দের উত্থান		
১৩০০						
১০০০	[illegible]					চৌ রাজবংশ
৭০০		আসিরীয় বিজয় পারসিক বিজয়		অসুরবানিপাল নেবুকাদনেজার		
৪০০						

অনুশীলনী ও করণীয় কাজ

১। বড় বড় নদীর উপত্যকায় প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল কেন?

২। লেখার আবিষ্কার কি ভাবে হয়েছিল?

৩। (ক) পিরামিড কি? কেন, কি ভাবে ও কখন এগুলি তৈরী হয়েছিল? সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরি করিয়েছিলেন কে?

(খ) মাটি দিয়ে পিরামিডের মডেল তৈরী কর।

৪। সাম্রাজ্যের যুগে মিশরের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? কেনই বা তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়?

৫। সভ্যতার ইতিহাসে মিশরের প্রধান অবদান কি কি?

৬। এগুলি সম্বন্ধে কি জান?

কর্ণাক, হিক্‌সস্‌, 'মমি', আমন-রা, পেপিরাস।

৭। রাজা হামুরাবি কে? তিনি মানুষের কি উপকার ক'রে গেছেন?

৮। শ্রেষ্ঠ আসিরীয় সম্রাট কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৯। "প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনকে আমি হত্যা করেছিলাম। নগরের ফটকের সামনে আমি এক প্রাচীর তৈরি করেছিলাম, জ্যান্ত অবস্থায় দলপতি বা রাজাদের চামড়া তুলে হত্যা ক'রে তাদের চামড়া দিয়ে প্রাচীর ঢেকে দিয়েছিলাম। কাউকে বা জ্যান্ত অবস্থায় দেয়ালে গেঁথে ফেলা হয়েছিল, কাউকে কাউকে দেয়ালের উপর সারি সারি শূলে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

বিজিত শত্রুর সম্বন্ধে অসুর সম্রাট ২য় অসুরবানিপালের এই উক্তি থেকে আসিরীয়দের সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা হয়?

১০। শূন্যোদ্যান কে তৈরি করেছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

১১। মানব সভ্যতায় বাবিলনীয়ার শ্রেষ্ঠ দান কি?

১২। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন? সেই প্রাচীন নগরের সঙ্গে আজকালকার নগরের তুলনা ক'রে ছোট একটি রচনা লিখ।

১৩। সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি? এই সভ্যতার বর্ণনা কর।

১৪। চীনের প্রাচীন যুগের পাঁচ জন আদর্শ রাজার কথা সব সত্য মনে হয় কি? আমাদের দেশের এ রকম দু' একজন রাজার নাম কর।

১৫। চৌ রাজত্বের শেষে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবু একে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

আর্যদের অভিযান

আর্যগণ
আরল সাগর
এশিয়া মাইনর
মাসিডোনিয়া
ট্রয়
মিশর
প্যালেস্টাইন
সুমের
সুসা
পার্সিপোলিস
পারস্য
হরপ্পা
মহেঞ্জোদড়ো
ভারতবর্ষ
আরব সাগর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্য জাতি, বৈদিকভারত, প্রাচীন ইরাণ ও গ্রীশ

সংস্কৃত আমাদের প্রাচীন ভাষা তা' তোমরা জান। এই সংস্কৃত আর ইরাণী, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল একটা মূল ভাষা থেকে। এই মূল ভাষায় যারা কথা ব'লত তাদের বলা হয় আর্য।

আর্যদের ভারতে আগমন :—আর্য জাতির আদি বাসস্থান যে কোথায় ছিল তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। খুব সম্ভব মধ্য-ইউরোপ থেকে মধ্য-এশিয়ার কোন অঞ্চলেই ছিল এঁদের আদি বাস। তখন আর্যরা ছিলেন যাযাবর—পশুর দল নিয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর—কি কারণে ঠিক বলা যায় না—এই আর্যগণ নূতন বাসস্থানের সন্ধানে এগিয়ে পড়তে লাগলেন। এক দিকে তাঁরা অভিযান ক'রলেন গ্রীশ, ইতালী প্রভৃতি দেশে, আর অন্য দিকে তাঁদের কতকগুলি দল এলো ইরাণে বা পারশ্যে। তাঁদের আর একটি শাখা আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলেন ভারতে। সে প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা।

প্রাচীন আর্য উপনিবেশ :—আর্যেরা ভারতে এসে ক্রমে সিন্ধু প্রভৃতি সাতটি নদীর তীরে বসতি স্থাপন ক'রলেন। তাই এ-অঞ্চলকে বলা হ'ত **সপ্তসিন্ধু**। আফগানের কাবুল (কুভা) নদী থেকে আরম্ভ ক'রে থানেশ্বরের নিকট সরস্বতী নদী পর্যন্ত সমস্ত স্থান জুড়ে ছিল সপ্তসিন্ধু। ইরাণীরা একে বলত 'হপ্তহিন্দ'। এভাবে সিন্ধু থেকেই পরে 'হিন্দু' নামের উৎপত্তি হয়েছে।

আর্য ও অনার্য :—এই স্থানের আদিম অধিবাসীরা কিন্তু বিনা যুদ্ধে বিদেশীদের স্থান ছেড়ে দেয়নি। দেশ অধিকার করতে গিয়ে

এদের সঙ্গে আর্যদের প্রায়ই যুদ্ধ করতে হ'ত। আর্যগণ এদের বলতেন 'দাস বা দস্যু'। পরে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল **অনার্য**। এই অনার্যরা ছিল কৃষ্ণকায়। তাঁদের নাক ছিল খাঁদা। কিন্তু

আর্যেরা ছিলেন দীর্ঘকায়, সুশ্রী ও অধিকতর বলিষ্ঠ। তাঁরা ঘোড়ায় বা ঘোড়ায় টানা রথে চ'ড়ে ও বর্শা, তীর, তরবারি, কুঠার প্রভৃতি লোহার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ ক'রতেন। এসব উন্নত ধরণের অস্ত্র অনার্যদের ছিল না। তাই তারা ক্রমে পরাজয় স্বীকার করতে

বাধ্য হ'ল। অনেকে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিল, কেহ বা দাসত্ব স্বীকার ক'রল।

আর্য অধিকার ও সভ্যতা বিস্তার ঃ—সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে ক্রমে আর্যগণ দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের মধ্যে তাঁরা বিদেহ ও উত্তর-বিহার পর্যন্ত অধিকার করেন এবং **কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, কোশল, বিদেহ** প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গে আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়। এইরূপে প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত আর্য অধিকারভুক্ত হয়, আর তার নাম হয় **আর্যাবর্ত**।

দাক্ষিণাত্য কিন্তু সহজে আর্য সভ্যতা গ্রহণ করে নি। সেখানে ছিল দ্রাবিড় জাতির একাধিপত্য। অবশেষে বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্যগণ দাক্ষিণাত্যেও উপনিবেশ স্থাপন ক'রতে আরম্ভ করেন। দক্ষিণ-ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের কথা আমরা জানতে পারি রামায়ণের গল্প থেকে। সেখানে ক্রমে **বিদর্ভ, চেদি, দণ্ডক** প্রভৃতি রাজ্য স্থাপিত হয়।

এই আর্যরা আবার নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হ'তেন। এসকল যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী মহাভারতে লেখা আছে। এসময়ে কুরু-পাঞ্চালের রাজারাই ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। কৌরব ও তাঁদের জ্ঞাতি পাণ্ডবদের মধ্যে কলহের ফলেই বাধে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর। বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী মিলিত হ'য়ে বড় বড় রাজ্য স্থাপন ক'রতে থাকে। শক্তিশালী রাজারা আশে পাশের অন্য রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা ক'রতেন। যাঁরা সফলকাম হ'তেন তাঁরা হ'তেন 'একরাট' এবং **রাজসূয় ও অশ্বমেধ** যজ্ঞ ক'রে নিজেদের সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব ঘোষণা করতেন। পৌরাণিক যুগের **সগর, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির** প্রভৃতি রাজারা অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন বলে জানা যায়।

বেদ :—আর্যগণ শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। তাঁরা সেই প্রাচীন কালেই সৃষ্টি করেছিলেন অপূর্ব সাহিত্য। আর্য-দের সব চেয়ে প্রাচীন গ্রন্থের নাম বেদ। বেদ একাধারে সাহিত্যও ধর্মগ্রন্থ। বেদ আবার চার ভাগে বিভক্ত—**ঋক্, সাম্, যজুঃ ও অথর্ব**। চার বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই শ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে প্রাচীন। ঋক্ অর্থ স্তব বা স্তোত্র। আর্যরা ছিলেন প্রকৃতির পূজারী, জীবনের আনন্দে ভরপুর। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি বা দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁরা এসকল কবিতা বা স্তোত্র রচনা ক'রতেন। ঋগ্বেদে এরকম বহু স্তোত্র আছে। কাব্য হিসাবেও এগুলি অতি সুন্দর।

রাষ্ট্র ও সমাজ :—আর্যগণ যখন সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, তখন তাঁরা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপজাতিতে বিভক্ত ছিলেন।
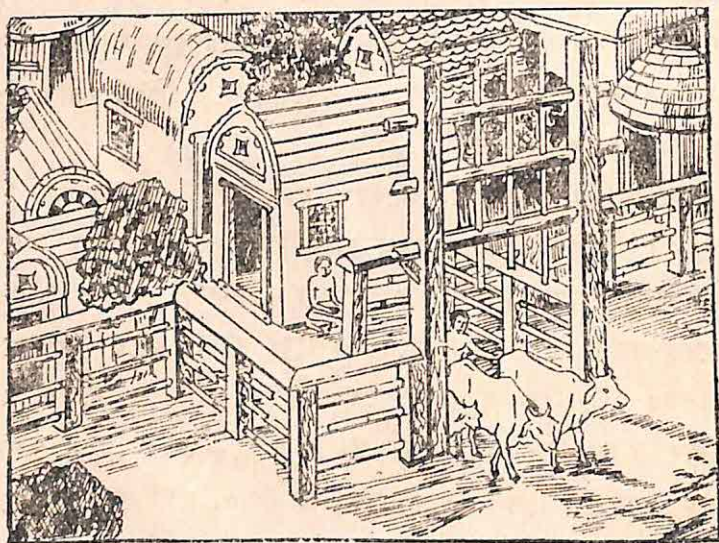
বৈদিক যুগের গ্রাম

সাধারণতঃ প্রত্যেক উপজাতি ছিল একজন রাজার শাসনাধীন। রাজা ছিলেন একাধারে বিচারক ও দেশরক্ষক। রাজার প্রধান উপদেষ্টা বা

মন্ত্রী ছিলেন পুরোহিত। বৈদিক যুগের রাজপুরোহিত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের প্রভাব ছিল অসীম। রাজা সব সময়ে স্বেচ্ছাচারী থাকতে পারতেন না। প্রজাদের 'সভা' বা 'সমিতি'র মতামতের গুরুত্ব ছিল। সময় সময় প্রজারাই রাজা নির্বাচন ক'রত।

ভারতীয় আর্যগণ ক্রমে কাজ ও গুণানুসারে চারিটি বিভাগে বা বর্ণে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। যাঁরা যাগ-যজ্ঞ, ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে থাকতেন তাঁরা ব্রাহ্মণ; যাঁরা দেশ-শাসন ও যুদ্ধ ক'রতেন তাঁরা ক্ষত্রিয়; যাঁরা কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রতেন তাঁরা বৈশ্য; আর যে সকল অনার্য বশ্যতা স্বীকার ক'রে আর্যদের দাস হয়েছিল তারা শূদ্র। এভাবে বর্ণভেদ বা জাতিভেদের সূচনা হ'য়েছিল। কিন্তু তখন জাতিভেদের মধ্যে কঠোরতা ছিল না।

আর্য সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে। সেকালের আর্যদের জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। কৃষিকার্য ও পশু-পালনই ছিল তাঁদের প্রধান জীবিকা। তা'ছাড়া কাপড় বোনা, সোনা-রূপার অলঙ্কার তৈরি করা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চামড়ার কাজ—এসবও তাঁরা জানতেন। দুধ, ঘি, যবাদি শস্য, ফলমূল ও মাংস ছিল তাঁদের প্রধান খাদ্য, আর সোমরস নামক এক রকম মদ ছিল প্রিয় পানীয়। পোশাক-পরিচ্ছদেও কোন আড়ম্বর ছিল না; কার্পাস ও পশমের পোশাক পরতেন তাঁরা। মৃগয়া বা শিকার, রথের দৌড়, নৃত্য-গীত, পাশাখেলা প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা তাঁদের জীবনে এনে দিত আনন্দ ও স্বাস্থ্য।

ধর্ম্মঃ—প্রথম অবস্থায় আর্যদের ধর্মও ছিল সরল। আর্যগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা ক'রে উপাসনা ক'রতেন। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র (সূর্য), মরুৎ (বায়ু), উষা প্রভৃতি ছিলেন তাঁদের প্রধান দেবতা। বৈদিক যুগে কোন মূর্তি অথবা মন্দির ছিল ব'লে মনে হয় না। প্রতি গৃহে ছিল অগ্নিশালা। আর্যগণ

দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুধ, ঘি, সোমরস প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি দিতেন। একেই বলা হ'ত **যজ্ঞ**। যজ্ঞের সময় তাঁরা স্তব বা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে প্রার্থনা করতেন। যাঁরা এসকল মন্ত্র রচনা ক'রতেন তাঁদের বলা হ'ত ঋষি। সে যুগের অনেক মহিলা ঋষিরও নাম পাওয়া যায়। বহু দেব-দেবীর উপাসনা করলেও ইঁহারা যে একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ মাত্র, তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

বেদের মন্ত্রের অনেক পরে আর্য ঋষিগণ রচনা করেন **উপনিষদ**। যাগ-যজ্ঞ ক্রমে জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। এসব ক্রিয়া-কাণ্ড ছেড়ে অনেক আর্য ঋষি লোকালয় থেকে দূরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে এক ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁদের এই সাধনার কথাই ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে উপনিষদ্ গ্রন্থে। আর্য ঋষিগণ উপনিষদ্‌গুলিতে সুন্দর সুন্দর গল্পের ভিতর দিয়ে এই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার ক'রেছেন।

সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ছিলেন **যাজ্ঞবল্ক্য**। তাঁর এক স্ত্রীর নাম ছিল **মৈত্রেয়ী**। যাজ্ঞবল্ক্যের মত তিনিও ব্রহ্মজ্ঞানকেই পরম ধন ব'লে মনে করতেন। বৃদ্ধ বয়সে যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসী হবেন স্থির ক'রে দুই স্ত্রীর মধ্যে ধন-সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিয়ে যেতে চাইলেন। তখন মৈত্রেয়ী বললেন,—ভগবন্, ধন নিয়ে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন,—না।

তখন মৈত্রেয়ী ব'লে উঠলেন, যা নিয়ে আমি অমর হব না, তা নিয়ে আমি কি করব ? আপনি আমাকে অমৃতের সন্ধান ব'লে দিন —আপনি যা জেনেছেন আমিও তা জানতে চাই।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে দিলেন অমৃতের সন্ধান—ব্রহ্মজ্ঞান। এরকম আরো অনেক গল্প আছে উপনিষদে।

আমাদের বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ যে পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ, তা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন।

প্রাচীন ইরাণ

আর্যদের কয়েকটি দল পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে এসে ইরাণের মালভূমিতে বসতি স্থাপন ক'রেছিল, সে কথা বলা হ'য়েছে। এই আর্যগণই প্রাচীন ইরাণী ভাষা গ'ড়ে তোলে। ইরাণী আর্যগণ ক্রমে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছিল। সেকথা পরে বলা হবে।

ইরাণীদের আদি ধর্মমত ছিল বৈদিকযুগের হিন্দুদের মত। হিন্দুদের মত তারাও মিত্র, বরুণ প্রভৃতি নানা দেবতার পূজা করত। যজ্ঞ বেদীতে আগুন জ্বেলে পবিত্র পানীয় সোমরস দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিত।

জরথুস্ত্রঃ—তারপর ইরাণীদের মধ্যে দেখা দিলেন এক মহাপুরুষ। তাঁর নাম **জরথুস্ত্র**—গ্রীক্‌রা বলত জোরোয়াষ্টার। খুব সম্ভব জরথুস্ত্র ছিলেন আমাদের দেশের বুদ্ধদেব আর চীনের ধর্মসংস্কারক কন্‌ফুসিয়সের সমসাময়িক। কারো কারো মতে তিনি তারও প্রায় চারশ' বছর আগেকার লোক। সেযাই হোক্, বুদ্ধদেব যেমন আমাদের ধর্মে যুগান্তর এনেছিলেন, জরথুস্ত্রও তেমনি প্রাচীন ইরাণী ধর্মমতের সংস্কার ক'রে তাকে দিয়েছিলেন নূতন রূপ। তাঁর ধর্মমত 'সৎ' ও 'অসৎ', 'সু' আর 'কু', 'আলো' আর 'অন্ধকার'—এই দুই বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতে মানুষের মনে এই দ্বন্দ্ব নিয়তই চলেছে। জরথুস্ত্রের মতে একদিকে হ'লেন আলোক ও স্বর্গের দেবতা **অহুরমাজদা** এবং তাঁর অধীন অন্যান্য দেবতা, আর অন্যদিকে হ'ল পাপের আধার **অহ্রিমাণ** আর তাঁর অনুচরগণ। অহুরমাজদার পূজাই তিনি শ্রেষ্ঠ পূজা ব'লে প্রচার করেন। তিনি তাঁর ধর্মে যাগ-যজ্ঞের চাইতে চরিত্রের উন্নতিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন। আর সেই জন্যেই প্রাচীন ইরাণী ধর্ম ইরাণীদের উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছিল। ইরাণীদের প্রাচীন স্তব-স্তোত্র আর জরথুস্ত্রের কিছু কিছু ধর্মোপদেশ সংগ্রহ ক'রে পার্শী ধর্ম-গ্রন্থ সঙ্কলন করা হয়। তাঁকে বলে **জেন্দ-আবেস্তা**। এই গ্রন্থ বেদ ও বাইবেলের মতই মূল্যবান।

ইরাণীদের বলা হয় অগ্নির উপাসক। কিন্তু বাস্তবিক তারা অগ্নিকে আরাধনা করে না, পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। ইরাণী পুরোহিতরা তাদের মন্দিরে আলোর দেবতা অহুরমাজদার প্রতীকস্বরূপ সর্বদা আগুন জ্বেলে রাখত, কখনও নিভ্‌তে দিত না। ইরাণী ধর্মের আর একটা বিশেষ প্রথা এই যে, তারা মৃতদেহ পোড়ায় না, সমাধিস্থও করে না, উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেয়।

আজ থেকে বহু বছর আগে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, ইরাণে যখন ইসলামের প্রচার হয় তখন ইরাণ থেকে একদল লোক এসেছিল ভারতবর্ষে। আমরা তাদের বলি পার্শী। তারা বোম্বাই অঞ্চলে বাস করে। ভারতবর্ষের এই পার্শী সম্প্রদায় আজও জরথুস্ত্রের ধর্ম মেনে চলে।

হোমরের যুগে গ্রীশ

আর্যদের গ্রীশ অধিকার :—আর্যজাতির কয়েকটি দল গ্রীশ দেশে প্রবেশ করেছিল। সে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কথা। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেকালে আর্যরা ছিল রুক্ষ, কঠোর যোদ্ধার জাত। গ্রীশে প্রবেশ করবার পাঁচ শ' বছরের মধ্যে আর্য গ্রীক্‌রা সমস্ত গ্রীশ দেশটা দখল ক'রে নিয়েছিল। এই নবাগত গ্রীক্‌রা নিজেদের ব'লত 'হেলেনীজ,' আর তাদের বাসভূমিকে ব'লত "হেলাস"।

উপনিবেশ স্থাপন :—গ্রীক্‌রাও নৌকা গ'ড়তে শিখেছিল। তারাও ক্রমে ওস্তাদ নাবিক হয়ে উঠল। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে রয়েছে ইজিয়ান সাগর। সেখানে আছে বহু ছোট ছোট দ্বীপ। গ্রীকরা এসব দ্বীপে ও এশিয়া মাইনরের উপকূলে গিয়ে আস্তানা গাড়তে লাগল। আর এই সূত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ যে না হ'ত তা নয়।

হোমর : ইলিয়াড ও ওডিসি :—হেলেনীদের মধ্যে ছিলেন অনেক গায়ক ও চারণ-কবি। এঁরা অতীতের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করতেন এবং রাজসভায় ও উৎসবাদিতে আবৃত্তি করতেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুখে মুখে এসব পুরাকাহিনী

চ'লে আসছিল। তারপর খ্রীঃ পূঃ দশম শতকের মধ্যেই এসব কাহিনী নিয়ে রচিত হয় দুটি মহাকাব্য—ইলিয়াড ও ওডিসি। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মতই এদু'টি অমর হ'য়ে আছে। হোমর নামে একজন অন্ধ কবি নাকি এ দু'টি মহাকাব্য রচনা করেন।

ট্রয়ের যুদ্ধ :—সে সময়ে এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত ট্রয় নগরী ছিল অতি সমৃদ্ধ। এই ট্রয়ের সহিত গ্রীকদের যুদ্ধের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে ইলিয়াড; যেমন, রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে আমাদের রামায়ণ। বহুকাল আগে ট্রয়ের এক রাজার নাম ছিল **প্রায়াম**। তাঁর পুত্রদের মধ্যে রূপে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **প্যারিস** কিন্তু বীরত্বে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **হেক্টর**। একবার প্যারিস গ্রীশে গিয়ে স্পার্টার রাজার অতিথি হন এবং তাঁর রাণী হেলেনকে চুরি করে নিয়ে আসেন। তখন স্পার্টার রাজা ভয়ানক রেগে গেলেন এবং গ্রীক বীরদের নিয়ে ট্রয় আক্রমণ করলেন। গ্রীকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন **একিলিস্**। ন'বছর যুদ্ধ চলল। তারপর একিলিস্ হেক্টরকে নিহত করলেন। কিন্তু তবু ট্রয় হার মানল না। তখন গ্রীকরা কৌশলের আশ্রয় নিল এবং নগর দখল

প্যারিস

ক'রে নিল। এই হ'ল ইলিয়াডের গল্প। আর ওডিসিতে বর্ণিত হ'য়েছে কি ভাবে গ্রীক বীর ওডিসিউস্ বহু আপদ-বিপদ কাটিয়ে অবশেষে নিরাপদে দেশে পৌঁছলেন।
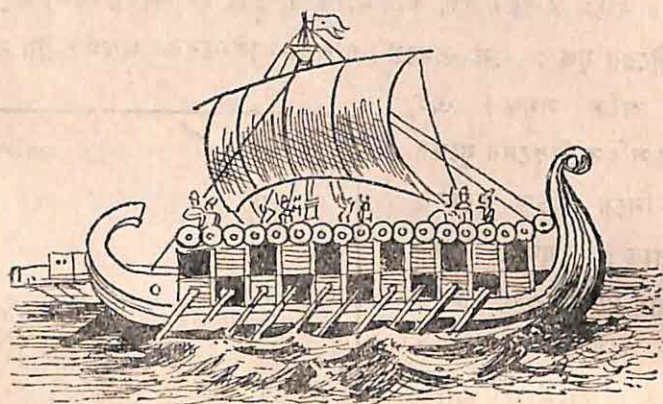
প্রাচীন গ্রীশের জাহাজ

হোমরের যুগে গ্রীশের অবস্থা :—হোমরের মহাকাব্য দু'টি থেকে আমরা গ্রীক সভ্যতার গোড়ার কথা অনেকটা জানতে পারি। প্রথমে অবশ্য আর্যগ্রীকরা গ্রামেই বাস ক'রত। তখন গরু ও মেষই ছিল তাদের প্রধান সম্পদ। কিন্তু ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারা পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে চাষবাসও আরম্ভ ক'রল। কিছুকাল পরে কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গ'ড়ে উঠল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা নগর। প্রত্যেক নগর ছিল স্বাধীন। প্রত্যেকেরই ছিল স্বতন্ত্র রাজা ও শাসন-ব্যবস্থা। সেজন্য প্রত্যেক নগরকে বলা হ'ত নগর-রাষ্ট্র। এসকল নগর বা রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। প্রত্যেক রাষ্ট্রে ছিল দু' শ্রেণীর নাগরিক, অভিজাত ও সাধারণ লোক। আর গ্রীক্‌রা যাদের পরাস্ত ক'রে দেশ অধিকার ক'রেছিল তারা ছিল ক্রীতদাস। তারা নাগরিক বলে গণ্য হ'ত না।

রাজা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীরই একজন। তিনি ছিলেন নগর-

রক্ষক, বিচারক ও পুরোহিত। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারতেন না, কারণ তাঁকে অভিজাতশ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত পরিষদের পরামর্শ নিয়ে রাজকার্য চালাতে হ'ত। তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হলে জনসাধারণের এক সমিতি ডাকা হ'ত। তাতে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষম নাগরিক নিজের মতামত জানাতে পারত।

প্রথমে কিছুকাল পর্যন্ত রাজার শাসন চ'লল কিন্তু ক্রমে অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে গেল। তখন অধিকাংশ নগরেই অভিজাতগণ রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে শাসনক্ষমতা হস্তগত ক'রল। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল **অভিজাততন্ত্র**, অর্থাৎ রাজার স্থানে কতিপয় উচ্চবংশীয় লোকের শাসন।

গ্রীকদের অনেক দেব-দেবী ছিল। গ্রীশের উত্তর প্রান্তে অলিম্পাস্ পর্বতের চূড়ায় দেবতারা বাস করে, এই ছিল তাদের ধারণা। গ্রীকদের প্রধান দেবতা ছিলেন **জিউস্**। তিনি আমাদের ইন্দ্রের মত—স্বর্গের দেবতা। সূর্যের দেবতা য়্যাপোলো ছিলেন তাদের খুব প্রিয়। তিনি ভবিষ্যৎ-বাণীর দেবতা। ভবিষ্যতের কথা কিছু জানতে হ'লেই গ্রীক্‌রা য়্যাপোলোর মন্দিরে যেত দৈব-নির্দেশ আনতে। আর দেবীদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন **য়্যাথেনা**। তিনি ছিলেন যুদ্ধের দেবী, আবার জ্ঞান ও চারু-শিল্পেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

গ্রীক্‌রা অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন নগর বা রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাস করত, কিন্তু তারা সকলে যে একই জাতি এ ধারণাও তাদের ছিল। তারা সকলেই নিজেদের 'হেলেন'-এর বংশধর ব'লে মনে ক'রত।

অনুশীলনী

১। আর্য ও অনার্য কাদের বলে? আর্যগণ কোথা হতে এসেছিলেন?

২। আর্যাবর্তে আর্যদের বসতি বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আর্য সভ্যতার প্রভেদ কোথায় বলতে পার কি?

৪। 'ঋষি' কাদের বলে? বৈদিক ঋষিরা আমাদের কি দিয়ে গিয়েছেন?

৫। বৈদিক যুগে আর্যদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ?

৬। বেদ কাহাকে বলে? উপনিষদ্ কাহাকে বলে? উপনিষদের যুগে ভারতীয় ধর্মে কি পরিবর্তন এসেছিল ?

৭। প্রাচীন হিন্দু রাজারা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রতেন কেন? এরকম দু'একজন রাজার নাম কর।

৮। ইরাণী ধর্মের সংস্কার করেন কে ? তাঁর কথা কি জান বল। আবেস্তা কি ?

৯। ইলিয়াড ও ওডিসি কার রচনা? ইলিয়াড ও ওডিসি থেকে আমরা প্রাচীন গ্রীশ সম্বন্ধে কি জানতে পারি সংক্ষেপে বল।

সময়-সূচক নক্সা

সময়-সূচক নক্সা

খৃঃ পূঃ	ভারতবর্ষ	ইরাণ	গ্রীশ
২০০০	আর্যজাতির আগমন ঋগ্বেদ	ইরাণী আর্যদের আগমন	
১৮০০		[illegible]	আর্য গ্রীকদের গ্রীশে আগমন। গ্রীশ, এশিয়া-মাইনর ও ইজিয়ান অঞ্চলে গ্রীক অধিকার স্থাপন
১৬০০	[illegible]	[illegible]	
১৪০০	[illegible]	[illegible]	
১২০০	[illegible]	[illegible]	
১০০০	[illegible]	জরথুস্ত্র	হোমর
৮০০	উপনিষদ রচনা		
৬০০			

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিনিশীয় ও ইহুদীদের কথা

ফিনিশীয়গণ ও ইহুদীরা প্রথমে ছিল যাযাবর। অতি প্রাচীন-কালে এরা আরবের মরুভূমি থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে বসতি স্থাপন ক'রেছিল। কাজেই তারা ছিল পরস্পরের জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী। এছাড়া এ দুই জাতির মধ্যে আর কোন মিল ছিল না। ইতিহাসে ফিনিশীয়রা সেরা নাবিক ও বণিক্ হিসাবে পরিচিত, আর ইহুদীরা তাদের ধর্মের জন্য অমর হ'য়ে আছে।

ফিনিশীয় বণিক্গণ—সিরিয়ার পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ছিল ফিনিশীয়দের দেশ—নাম **ফিনিশিয়া**। ফিনিশিয়া সমুদ্রতীরে সঙ্কীর্ণ দেশ। এর পূর্বদিকে লেবানন পর্বত,—সেদিক দিয়ে বেরুবার পথ নেই। কেবল পশ্চিমদিকে সমুদ্রে বেরুবার পথ ছিল খোলা। জন্মের পর থেকেই তাদের সমুদ্রের সঙ্গে হ'ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই প্রথম থেকেই ফিনিশীয়রা হ'য়ে উঠেছিল সুদক্ষ ও সাহসী নাবিক। পর্বতের ঢালুতে জন্মাত প্রচুর দেবদারু গাছ। এই গাছের কাঠ দিয়ে তারা ছোট থেকে ক্রমে বড় বড় নৌকা তৈরি ক'রতে শিখল, আর এসব নৌকা দিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে লাভবান হ'তে লাগল। তাদের প্রধান দু'টি বন্দর **টায়ার** ও **সিডন** বাণিজ্যের কল্যাণে উন্নত হয়ে উঠল।

ফিনিশীয়দের এসব জাহাজ দেখতে কেমন ছিল পরের পৃষ্ঠার ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। এ জাহাজকে বলা হয় **'গ্যালি'**। মাঝ-খানে মস্ত বড় মাস্তুল, তাতে আছে প্রচণ্ড পাল খাটাবার ব্যবস্থা। জাহাজের মাঝখানটা জুড়ে উচু ডেক্ আর তার নিচের তলায় দু'সারিতে অনেকগুলি দাঁড়। এক সঙ্গে এসব দাঁড় টানত

ক্রীতদাসেরা। আজ কালকার সমুদ্রগামী বড় বড জাহাজ কিংবা তাদের ছবি তোমরা নিশ্চয় দেখেছ। এসব জাহাজের তুলনায় সে-যুগের এই গ্যালি ছিল কত ছোট! তা ছাড়া সে-যুগে না ছিল
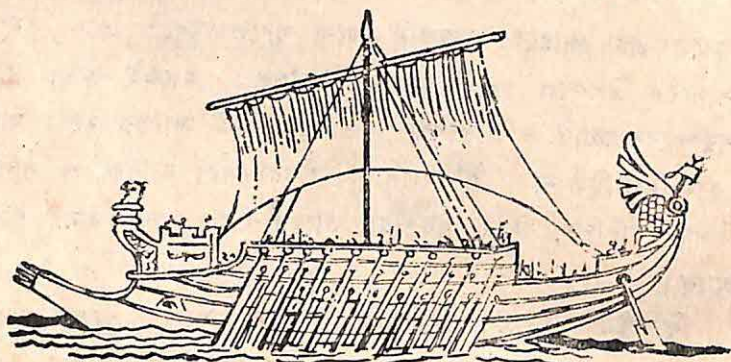
ফিনিশীয়দের জাহাজ

কম্পাস, না ছিল জোরালো বাতি; পদে পদে পথ ভুল হবার ভয় ছিল। দিনের বেলায় সূর্য আর রাত্রি বেলায় নক্ষত্রের সাহায্যে পথ চিনতে হ'ত। তবু ফিনিশীয় বণিকেরা অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমাতে ভয় করত না, এমনি দুর্জয় ছিল তাদের সাহস। গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ ব'লে গেছেন যে, খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতকে নাকি ফিনিশীয় নাবিকেরা একবার সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশটা ঘুরে এসেছিল।

বাণিজ্য ও উপনিবেশ :—মিশরের পতনের পর ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য এই ফিনিশীয়দেরই হস্তগত হ'য়েছিল। প্রথমে তারা অবশ্য মিশর থেকে গ্রীশ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলেই বাণিজ্য ক'রত, কিন্তু ক্রমে তাদের বাণিজ্য-জাহাজ পশ্চিম দিকে সিসিলি, ইতালী, আফ্রিকা, স্পেন, এমন কি বৃটেন পর্যন্ত যাতায়াত ক'রতে লাগল। পণ্য সংগ্রহ ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তারা আফ্রিকা ও ইউরোপের উপকূলে অনেকগুলি ঘাঁটি ও উপনিবেশ স্থাপন কর'ল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল

আফ্রিকার উপকূলে কার্থেজ। টায়ারের পতনের পর এই কার্থেজই হ'য়ে উঠল তাদের প্রধান নগরী। পরে কার্থেজ ক্ষমতায় ও ঐশ্বর্যে রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফিনিশীয়রাই সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। তাদের মারফৎই চ'লত পৃথিবীর নানাদেশের রকমারী জিনিসের বিনিময় ও বেচা

ফিনিশীয় বণিক

কেনা। শুধু জল-পথে নয়, স্থল-পথেও এরা বাণিজ্য ক'রত নানা দেশের সঙ্গে। তারা শস্য, বস্ত্র, দামী পাথর, লোহা, তামা, সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত প্রভৃতি রকমারি পণ্যের ব্যবসা ক'রত। মিশর ও অন্যান্য সভ্য দেশের দেখাদেখি চতুর ফিনিশীয়গণ নিজেদের শিল্পেরও খুব উন্নতি ক'রেছিল। তাদের তৈরী সূক্ষ্মবস্ত্র, কাঁচ, চীনা মাটির বাসনপত্র ও ধাতুদ্রব্য সকলে সমাদরে গ্রহণ ক'রত। শামুক-জাতীয় এক প্রকার মাছ থেকে তারা এমন চমৎকার বেগুনী রঙ্ তৈরী ক'রত যে সেকালের রাজরাজড়াদের এই বেগুনী রঙের পোশাক না হ'লে চলতই না।

এই ফিনিশীয় বণিকদের আবার দুর্নামও ছিল খুব। প্রায় পাঁচশ' বছর আগেকার আমাদের দেশের পর্তুগীজ বণিকদের মত এরাও জল-পথে দস্যুবৃত্তি ক'রত আর নানা দেশ থেকে ছেলেমেয়ে ধ'রে এনে দাসরূপে বিক্রী ক'রত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে সভ্যতা বিস্তার :—ফিনিশীয়গণ নিজস্ব কোন সভ্যতার সৃষ্টি করেনি; তারা ছিল মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার বাহক। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে তারা প্রাচ্যের এই সভ্যতা ইউরোপের গ্রীশ ও অন্যান্য দেশে বিস্তার করেছিল। কিন্তু ফিনিশীয়দের শ্রেষ্ঠ দান হল তাদের বর্ণমালা।

∡	A	ᛘ	M
𐤁	B	𐤍	N
𐤂	C.G	O	O
𐤃	D	𐤐	P
H	E.H	𐤓	R
Y	F.U.V	W	S
6	L	X	T

ফিনিশীয় বর্ণমালা (পাশাপাশি ইংরাজী অক্ষর আছে)

হিসাব-পত্র রাখার সুবিধার জন্য তারা মিশরের চিত্র-লিপি থেকে কতকগুলি চিহ্ন বেছে নেয় এবং সেগুলির উন্নতি ক'রে অক্ষর-মালার সৃষ্টি করে। এই অক্ষর-মালায় ছিল মাত্র ২২টি অক্ষর; এর মধ্যে স্বরবর্ণ ছিল না। গ্রীকরা এদের কাছ থেকে এই অক্ষর-মালা নিয়ে এতে স্বরবর্ণ যোগ ক'রে নেয়। ফিনিশীয়দের আলেফ, বে ইত্যাদি হ'ল গ্রীকদের আলফা, বিটা ইত্যাদি। গ্রীকদের কাছ থেকে আবার এই অক্ষর-মালা নিল রোমানেরা আর এই রোমানদের কাছ থেকেই ইউরোপের লোকেরা পেয়েছে তাদের বর্তমান বর্ণমালা।

হিব্রু বা ইহুদীগণ :—ইহুদীরা ছিল ক্ষুদ্র একটি যাযাবর জাতি। তারা কোন সাম্রাজ্যও গড়েনি, শিল্প বিজ্ঞানেও তাদের কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই। কিন্তু তারা জগৎকে দিয়ে গেছে এমন একটি অপূর্ব বস্তু যা মিশর বা বাবিলনও দিয়ে যেতে পারে নি।

সেটা হ'ল তাদের **উচ্চস্তরের ধর্ম ও নৈতিক আদর্শ**, যাকে ভিত্তি ক'রেই পরে খ্রীস্টান ধর্মের সৃষ্টি হ'য়েছিল। ইহুদীদের ধর্ম-গ্রন্থ হ'চ্ছে বাইবেলের প্রথমাংশ। তাকে খ্রীস্টানরা বলে **ওল্ড টেস্টামেণ্ট** অর্থাৎ পুরাতন শাস্ত্র। তাদের ইতিহাস, তাদের ধর্ম ও চিন্তার ধারা—এসব আমরা জানতে পারি ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে।

অতি বিচিত্র এই ইহুদীদের ইতিহাস। বাইবেল থেকে জানা যায়, তাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য নেতা বা দলপতি ছিলেন **আব্রাহাম**। খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে, সম্রাট হামুরাবির সময়ে, উর থেকে এই ইহুদীরা তাদের মেষপাল নিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা আরম্ভ করে খাদ্যের সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পেঁ ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী **কানান** দেশে। এই কানানই পরে প্যালেস্টাইন নামে অভিহিত হয়েছে। ইহুদীদের দেবতা **যিহোভার** নির্দেশেই নাকি আব্রাহাম এসেছিলেন কানানে। তাই কানানকে তারা বলতো ভগবানের 'প্রতিশ্রুত দেশ'।

কিছুকাল পর কানানে দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। তখন আব্রাহামের বংশধরেরা চ'লে গেল মিশরে। সেখানে বহুদিন হিক্‌সস্ রাজাদের অধীনে তারা বেশ সুখেই কাটাল। হিক্‌সস্ বিতাড়নের পর মিশরী ফারাওরা তাদের ক্রীতদাস ক'রে রাখল। ফলে তাদের জীবন হয়ে উঠল বিষময়।

মোজেস্ ও ঈশ্বরের দশ আদেশ—অবশেষে ইহুদীদের মধ্যে দেখা দিলেন এক মহাপুরুষ। তাঁর নাম মোজেস বা মূসা। যিহোভার পরম ভক্ত তিনি। বহু দুঃখের পর তাঁরই মুখ দিয়ে এল মুক্তির ডাক। তিনি মিশরীদের ফাঁকি দিয়ে ইহুদীদের নিয়ে চললেন 'প্রতিশ্রুত দেশ' প্যালেস্টাইনের দিকে। একথা জানতে পেরে ফারাও সৈন্য নিয়ে ছুটলেন তাদের ধ'রতে। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মোজেস্ যখন ইহুদীদের নিয়ে লোহিত সাগরের

তীরে পৌঁছলেন, ইচ্ছায় সাগরের জল নাকি দু'ভাগ হয়ে পথ করে দিল। ইহুদীরা নিরাপদে সাগর পার হয়ে গেল। এদিকে মিশরী সৈন্যও লোহিত সাগরের তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারাও ইহুদীদের পেছনে পেছনে সাগর পার হতে গেল। কিন্তু অপর তীরে পৌঁছেই মোজেস্ যেই তাঁর হাত সাগরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, অমনি দু'দিকের জল হু হু করে এসে নাকি পথ বন্ধ করে দিল, আর রথ, ঘোড়া সব নিয়ে সকল মিশরী সৈন্য ডুবে মরল।

পথে পড়ল সিনাই। সেখানে পর্বতের উপর যিহোভা নাকি মোজেসের নিকট ইহুদীদের প্রতি তাঁর 'দশ আদেশ' ব্যক্ত করলেন। এই 'দশ আদেশ' ইহুদীদের পবিত্র জীবন যাপন ক'রতে শিক্ষা দেয়; যেমন—যিহোভা ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে মানবে না; অকারণে ঈশ্বরের নাম নেবে না; চুরি করবে না; পিতামাতাকে সম্মান করবে ইত্যাদি। এরূপে বহু কষ্টের পর হিব্রুরা এসে কানান দখল ক'রল; কিন্তু তাদের দুঃখ একেবারে ঘুচল না। প্রতিবেশী শত্রুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চ'লল বহুদিন।

ডেভিড ও সলোমন—অবশেষে শত্রুর সঙ্গে ভাল ক'রে লড়বার জন্য ইহুদীরা তাদের সর্ব প্রথম রাজা নির্বাচন ক'রল **সল** নামে একজন নেতাকে। কিন্তু তিনিও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না। তারপর রাজা হলেন **ডেভিড**। ডেভিড শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি জেরুজালেম অধিকার ক'রে সেখানে রাজধানী স্থাপন করলেন। ফিনিশীয়দের সঙ্গে মিত্রতা ক'রে তিনি জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত করলেন। ডেভিড শুধু বড় রাজা ছিলেন না, বড় কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ বলেও তাঁর নাম ডাক ছিল খুব।

কিন্তু রাজা ডেভিডের পুত্র **সলোমনই** ছিলেন ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সময়ে ইহুদী রাজ্য আরো বড় ও শক্তিশালী হ'য়ে উঠল। সে সময়ে জেরুজালেমের পথ দিয়েই চ'লত বিভিন্ন দেশের

বাণিজ্য। তাই জেরুজালেম সেকালের একটা বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়াল। ফলে ইহুদী রাজ্যের সম্পদ দিন দিন বেড়ে উঠল। রাজা সলোমন বিদেশ থেকে শিল্পী এনে জেরুজালেমে যিহোভার এক সুন্দর মন্দির ও নিজের প্রাসাদ তৈরী ক'রলেন। আবার তিনি ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। রাজা সলোমনের জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে প'ড়ল-বিদেশে।

ইহুদীদের দীর্ঘ ইতিহাসে ওই একবারই যা-কিছু সৌভাগ্যের উদয় হ'য়েছিল। রাজা সলোমনের পরই আরম্ভ হ'ল ঘোর দুর্দিন। উত্তরাংশ নিয়ে হ'ল ইস্‌রায়েল, আর দক্ষিণাংশে জেরুজালেমকে কেন্দ্র ক'রে হ'ল জুডা। তারপর খ্রীঃ পূঃ ৭২১ অব্দে আসিরীয়গণ ইস্‌রায়েল দখল ক'রে ইস্‌রায়েলবাসীদের বন্দী ক'রে নিয়ে গেল। শতাধিক বৎসর পর ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার জেরুজালেম ধ্বংস ক'রে ইহুদীদের বাবিলনে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখেন। পরে পারশ্য সম্রাট সাইরাস বাবিলন দখল ক'রে তাদের মুক্তি দেন।

ইহুদী মহাপুরুষদের দান :—ইহুদীদের স্বাধীনতা লোপ পেল কিন্তু ধর্ম-জগতে তাদের নাম অমর হ'য়ে রইল। জেরুজালেমের পতনের আগে থেকেই তাদের মধ্যে আমোস, ইশাইয়া প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের কথা আমরা জানতে পারি ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে। তাঁদের প্রেরণায় ইহুদীদের প্রাণে গভীর ধর্মভাবের উদয় হ'য়েছিল। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর এক ; যিহোভা শুধু ইহুদীদের ঈশ্বর নন, বিশ্বের সকল মানবেরই ঈশ্বর তিনি। কোন রকম পুতুল-পূজা তাঁরা সহ্য করতেন না।

এই মহাপুরুষদের শিক্ষায় ইহুদীদের আর একটা বিশ্বাস এই ছিল যে, একমাত্র তারাই ঈশ্বরের অনুগৃহীত জাতি ; সুতরাং তারা অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া তাদের ছিল ধর্মের প্রতি

গভীর নিষ্ঠা। এইজন্য পরবর্তী কালে দেশ ও স্বাধীনতা হারিয়ে ইহুদীরা নানা দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'লেও প্রাচীনকালের অনেক জাতির মত তারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি। তারা নিজেদের ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখতে পেরেছে। কিছুদিন আগে আবার প্যালেস্টাইনে নূতন ইহুদী রাজ্য হয়েছে।

অনুশীলনী

১। সেমিটিক ভাষা-ভাষী জাতিগুলির নাম কর। এদের সঙ্গে আর্যদের প্রভেদ কি? ফিনিশীয় ও ইহুদীদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

২। ফিনিশীয়রা কি কারণে বণিক নাবিকের জাতি হয়েছিল?

৩। ফিনিশীয়দের বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপনের কথা সংক্ষেপে বল।

৪। হিব্রু বা ইহুদীরা ইতিহাসে কি জন্য বিখ্যাত? তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে কি জান?

৫। ইহুদী মহাপুরুষদের অবদান কি?

প্রাচীন গ্রীশের চিত্রিত পাত্র
(এথেনীয় মেয়েরা ঝরণা থেকে জল নিচ্ছে)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রীশের নগর-রাষ্ট্র—এথেন্স ও স্পার্টা

রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব :—এশিয়ার প্রাচীন সভ্য জাতি-গুলির সঙ্গে গ্রীক্‌দের একটা মস্ত বড় প্রভেদ ছিল এই যে, তারা সমস্ত গ্রীশ জুড়ে একটা রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে নি। মিশর, সুমের, চীন প্রভৃতি দেশেও প্রথমে কতকগুলি স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রকে আশ্রয় ক'রেই সভ্যতার উদয় হয়েছিল ; কালক্রমে এসব নগর-রাষ্ট্র মিলিয়ে বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রীশের নগর-রাষ্ট্রগুলি বরাবর বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল। তার প্রধান কারণ হ'ল গ্রীশের ভূ-প্রকৃতি। গোটা গ্রীশ দেশটাই পাহাড়-পর্বতে ভরা ; তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট উপত্যকা। এসকল উপত্যকায় ছিল নগর-রাষ্ট্রগুলি। এদের মধ্যে যোগাযোগ রাখা সহজ ছিল না। তাই

সময়-সূচক নক্সা

খ্রীঃ পূঃ	ফিনিশীয়গণ	ইহুদীগণ
২০০০	ভূমধ্যসাগরের ফিনিশীয় পোত	আব্রাহামের অধীনে হিব্রুদের ভ্রমণ আরম্ভ
১৮০০		
১৬০০		
১৪০০	ফিনিশীয়গণ শ্রেষ্ঠ জাহাজী ও কারবারী	প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন
১২০০		
১০০০		রাজা ডেভিড
৮০০	কার্থেজ নগরীর প্রতিষ্ঠা	সলোমন
৬০০		আসিরীয়দের ইস্রায়েল জয়
৪০০	ফিনিশীয় নাবিকদের আফ্রিকা প্রদক্ষিণ	নেবুকাদনেজার কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংস

প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রই ছিল স্বাধীন। বিভিন্ন নগরের গ্রীক্‌রা এশিয়া মাইনর, সিসিলি, ইতালি, প্রভৃতি দূর দূর দেশে যেসব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেগুলিও ছিল স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র। শত্রুর সঙ্গে লড়তে গিয়েও গ্রীক্‌রাষ্ট্রগুলি সকলে সংঘবদ্ধ হতে পারত না।

শাসন-ব্যবস্থা :—গ্রীক্‌দের এসকল নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধান ছিল **এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ ও থিব্‌স**। এদের শাসন-ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন রকমের। প্রথমে সর্বত্রই রাজতন্ত্র ছিল, সে কথা শুনেছ। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই শাসন-ক্ষমতা চলে গিয়েছিল কয়েকজন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের হাতে। স্পার্টায় অবশ্য রাজতন্ত্রই রয়ে গেল, কিন্তু একটু নূতন আকারে। সেখানে দু'জন রাজা একসঙ্গে শাসন করতেন।

উচ্চবংশীয় শাসকগণের অত্যাচারে সাধারণ লোকের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হ'য়ে উঠল। কাজেই তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। তার ফলে স্পার্টা ছাড়া এথেন্স প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রে এক নূতন শাসন-ব্যবস্থা দেখা দিল,—তাকে বলে **গণতন্ত্র**। এর অর্থ হল জনগণের শাসন অর্থাৎ একজন বা কয়েকজনের স্থলে অনেকের শাসন। আজকালকার মত গ্রীক্‌ নাগরিকেরা প্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে পরিষদে পাঠাত না। তাদের রাষ্ট্রগুলি ছিল অত্যন্ত ছোট; তাই অল্প-সংখ্যক পুরুষ নাগরিকেরা সকলে একত্র সমবেত হ'য়ে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা স্থির করত।

স্পার্টা ও এথেন্স :—গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্সই ছিল বিখ্যাত। কিন্তু এক ভাষা ছাড়া এদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না। এদের আদর্শ ও জীবনযাত্রা ছিল ভিন্ন রকমের।

গ্রীশের দক্ষিণাংশে ছিল স্পার্টা। কথিত আছে, **লাইকারগাস** নামে একজন বিখ্যাত লোক স্পার্টায় কতকগুলি কড়া নিয়ম বেঁধে

দেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকটি স্পার্টানকে বীর সৈনিক ক'রে গ'ড়ে তোলা। সাত বছর পূর্ণ হলেই প্রত্যেক ছেলের শিক্ষার ভার নিত রাষ্ট্র। আঠার বছর পর্যন্ত তাদের থাকতে হ'ত শিক্ষা-শিবিরে। পরে আরম্ভ হ'ত সৈনিক জীবন। সমস্ত স্পার্টা ছিল যেন একটা যুদ্ধশিবির। শরীর-চর্চা, আহারে-বিহারে কঠোর সংযম আর কষ্ট-সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক স্পার্টান যুবককে দৃঢ়-চরিত্র
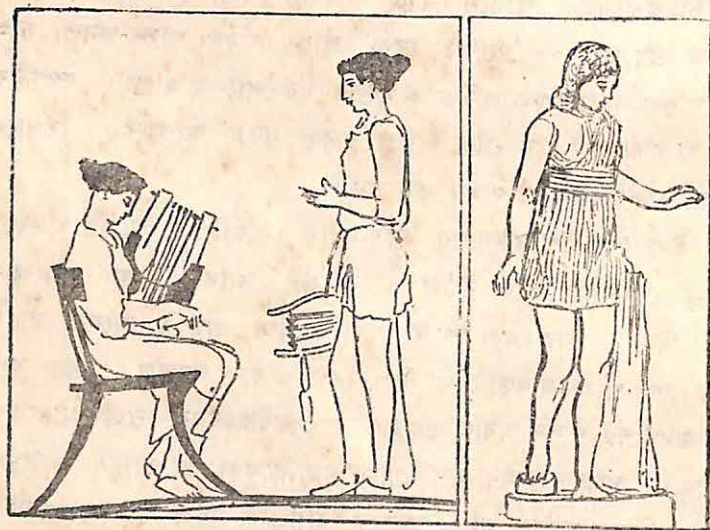
দু'দেশের শিক্ষায় কত প্রভেদ !
(বাঁ দিকে এথেন্সের মেয়েরা বীণা বাজাতে শিখছে আর
ডানদিকে স্পার্টার মেয়ে দৌড়-ঝাঁপ করছে।)

ক'রে গ'ড়ে তোলা হত। যৎসামান্য লেখাপড়া ছাড়া শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান—এসব কিছুই তাদের শিক্ষা দেওয়া হত না। মেয়েরাও অনেকটা এরকম শিক্ষাই পেত। স্পার্টার প্রত্যেক মা-ই নাকি ছেলেকে যুদ্ধে যাবার সময় এই বলে বিদায় দিতেন,—ফিরে এস হয় ঢাল নিয়ে, না হয় ঢালের উপর শুয়ে ; অর্থাৎ যুদ্ধে হেরে কাপুরুষের মত জ্যান্ত অবস্থায় ফিরে এসো না। এ শিক্ষার ফলে স্পার্টান

সৈন্যেরা হ'য়ে উঠেছিল অজেয়। কিন্তু গ্রীশের শিল্প ও সাহিত্যে স্প্যার্টানরা কিছুই দিয়ে যেতে পারে নি।

এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল একেবারে ভিন্ন রকমের। স্পার্টার মত এখানে রাষ্ট্র সকল ছেলেমেয়েকে একই ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেনি। বিদ্যালয়গুলি সব ছিল বেসরকারী লোকের হাতে। গুরুমহাশয়েরা স্কুল চালাতেন। ছেলেরা সাত থেকে ষোল বছর পর্যন্ত ইতিহাস, সঙ্গীত, ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করত। মেয়েরা কিন্তু বাড়ীতেই গৃহস্থালীর কাজ, সূতা কাটা, কাপড় বোনা, সেলাইয়ের কাজ, গান-বাজনা ও সাধারণ লেখা-পড়া শিখত। আঠার বছর বয়স হ'লে ছেলেরা দু'বছরের জন্য সৈন্যদলে যোগ দিত। এভাবে শিক্ষা শেষ হ'লে তারা পূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করত। সুতরাং আমরা দেখতেই পাই, এথেন্স স্পার্টার মত শুধু শরীর চর্চার উপরই জোর দেয় নি, সেখানে ছেলে-মেয়েদের মানসিক শক্তির বিকাশের দিকেও সমান দৃষ্টি দেওয়া হ'ত।

সেকালের এথেন্সের নাগরিকদের দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটত ঘরের বাইরে,—রাস্তায় ও বাজারে। সেখানে বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা-শুনা ও আলাপ-আলোচনা চ'লত। এথেন্সে ছিল গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন। এজন্য সকল নাগরিকেরই কালক্রমে সরকারী কাজ করতে হ'ত। সাংসারিক কাজে নাগরিকদের বেশী সময় লাগত না। অপরাহ্ণে তারা পরিষদে যোগদান করত, না হয় বিচার ক'রত, আর না হয় জুরি হ'য়ে বসত। কিন্তু নাগরিকেরা যদি অধিকাংশ সময়ই বাইরে কাটাত, তাহলে তাদের অন্য সব কাজ করত কারা? সে-সব ক'রত দাসরা। তারাই নিজ নিজ প্রভুর ঘর-বাড়ী ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ-বাস ইত্যাদির দেখা-শুনা করত।

গ্রীকসভ্যতা :—খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে, প্রথমে পারশ্য সম্রাট দরায়াস্, তারপর জার্কসীজ গ্রীশ আক্রমণ করেন।

কিন্তু গ্রীক্‌দের কাছে দু'বারই পরাস্ত হ'য়ে তাঁদের ফিরে যেতে হয়। এই বিজয়ের পর শুরু হ'ল গ্রীক ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। এ গৌরব অবশ্য দেড়শ' বছরের বেশী স্থায়ী হয় নি। তাহ'লেও পৃথিবীর ইতিহাসে তা' অক্ষয় হ'য়ে আছে।

যে সময়ের কথা ব'লছি, তখন এথেন্সনগরীই ছিল সব দিক দিয়ে গ্রীশের মুকুটমণি ; কারণ সেখানেই হয়েছিল গ্রীক্ সভ্যতার চরম

পেরিক্লিস্

বিকাশ। এ সময়ে একজন মস্তবড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এথেন্সের নায়ক পেরিক্লিস্। তিনি গ্রীঃ পূঃ ৪৬০ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত এথেন্সে সর্ব-প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি নৌ-শক্তি বাড়িয়ে এথেন্সকে সবচেয়ে শক্তিশালী ক'রে তুললেন। তখন অনেক গ্রীক্ নগরী এথেন্সের নেতৃত্ব স্বীকার ক'রল। এভাবে পেরিক্লিস্ গ'ড়ে তুললেন এথেনীয় সাম্রাজ্য। সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, সব দিকে দেখা দিল এক অপূর্ব স্ফুরণ। পারশিকরা এথেন্স নগরী পুড়িয়ে দিয়েছিল।

পেরিক্লিস্ বড় বড় শিল্পীদের ডেকে এনে এথেন্স নগরীকে আবার গড়ে তুললেন আশ্চর্য সুন্দর করে। তাঁকে কেন্দ্র করে বড় বড় সব চিন্তাবীর এথেন্সে এসে সমবেত হ'লেন। তাই গ্রীক ইতিহাসের এ-যুগকে বলা হয় **"পেরিক্লিসের যুগ"**।

সে-যুগের ভাস্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **ফিডিয়াস্**। এথেন্স নগরীর মাঝখানে পাহাড়ের উপর পেরিক্লিস্ তৈরি করান য়্যাথেনা দেবীর অতি সুন্দর এক মন্দির, তাকে বলে **পার্থেনন**। এই পার্থেনন ফিডিয়াস্ ও তাঁর শিষ্যদের এক অমর কীর্তি। এ মন্দিরের জন্য ফিডিয়াস্ য়্যাথেনা দেবীর যে মূর্তি তৈরি করেন তার সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তিনি দেবরাজ জিউসেরও এক অপূর্ব মূর্তি নির্মাণ করেন।

ইস্কিলাস, সফেক্লিস্, ইয়ুরিপিডিস্ ও আরিস্টফেনিস্ ছিলেন সে-যুগের এথেন্সের চারজন খ্যাতনামা নাট্যকর। আমাদের দেশের
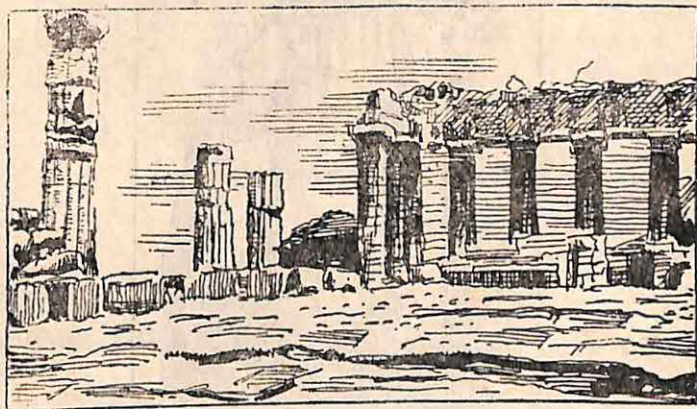
পার্থেনন

মহাকবি কালিদাসের নাটকের মত এদের রচিত নাটকও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। অনেকের মতে এঁদের মধ্যে ইয়ুরিপিডিসই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সাধারণ নর-নারীর ব্যথা-বেদনাই ছিল তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। তার একটি বিখ্যাত

নাটকের নাম হ'ল 'ট্রয় নগরের মেয়ে'। যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ, বিশেষ ক'রে ট্রয়ের যুদ্ধ যে সেখানকার রাণী হেকুবার জীবনে কত বড় দুঃখ এনে দিয়েছিল, তা'ই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটকে। এসকল নাটকের অভিনয়ের জন্য এথেনীয়গণ উন্মুক্ত আকাশের নীচে নাট্যশালা নির্মাণ ক'রেছিল।

দেবী য়্যাথেনা

পেরিক্লিসের যুগের দুজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন **হেরোডোটাস্** ও **থুসিডিডিস**। হেরোডোটাস্ই প্রথম ইতিহাস রচনা করেন। তাই তাঁকে বলা হয় 'ইতিহাসের জনক'। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে

পারশিক্‌দের গ্রীশ আক্রমণের কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। আর থুসিডিডিস্‌ লিখে গেছেন তাঁর জন্মভূমি এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার যুদ্ধের কথা।

এথেন্সের এই গৌরবের যুগের মনীষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **সক্রেটিস**। তিনি দেখতে ছিলেন কদাকার কিন্তু মনটা ছিল তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার। সত্যের সন্ধানই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি নিজে কোন বই লেখেন নি, কোন বিদ্যালয়ও খুলে বসেন নি। তিনি

হেরোডোটাস্‌

থুসিডিডিস্‌

খালি পায়ে অতি সাধারণ বেশে পথে পথে, বাজারে ও ব্যায়াম-শালায় ঘুরে বেড়াতেন, আর যুবকদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে তাদের ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে নূতন সত্যের সন্ধান দিতেন। কোন কিছুই তিনি যুক্তি দিয়ে যাচাই না ক'রে গ্রহণ করতেন না। তখন পেরিক্লিসের মৃত্যু হ'য়েছে। এথেন্সের শাসক-শ্রেণীর সে উদারতা আর নেই।

তাঁরা সক্রেটিসের এ সকল স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি নগরের যুবকদের মন কলুষিত ক'রছেন, এই অভিযোগে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হ'ল। বলা হল, তিনি যদি তাঁর মতিগতির পরিবর্তন করেন তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু সত্যের পূজারী সক্রেটিস এতে রাজী হ'লেন না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিচারক ও এথেন্সবাসীদের সম্বোধন ক'রে ব'ললেন—

সক্রেটিস্

"আমি আমার সত্যানুসন্ধান থেকে বিরত থাকবো এই শর্তে আপনারা আমাকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছেন। সেজন্য আপনাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু আপনাদের আদেশ পালনে আমি অক্ষম, কারণ আমি ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছি। যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন সত্যানুসন্ধানে আমি বিরত হব না।··· আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি শুধু জানি যে কর্তব্য কাজ থেকে বিরত থাকা অন্যায়! অন্যায়কে স্বীকারকরার চেয়ে আমি মৃত্যুকেবরণ ক'রেনিচ্ছি!"

সক্রেটিসের অনেক শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্লেটো। তিনি ছিলেন বড় দার্শনিক, গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। তিনি তাঁর 'একাডেমি' নামক আশ্রমে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। তিনি অনেক বই লিখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে তাঁর গুরু সক্রেটিস্ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

প্লেটোর পর তাঁর স্থান অধিকার করেন আর একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁর নাম এরিস্টটল। তিনি কয়েক বৎসর মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডারের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, জীব-বিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান

প্রভৃতি বিষয়ে বই লিখে গেছেন। পরবর্তী কালে তাঁর লেখা জগতে যতটা প্রভাব বিস্তার করে, এমন আর কারো লেখা করেনি।
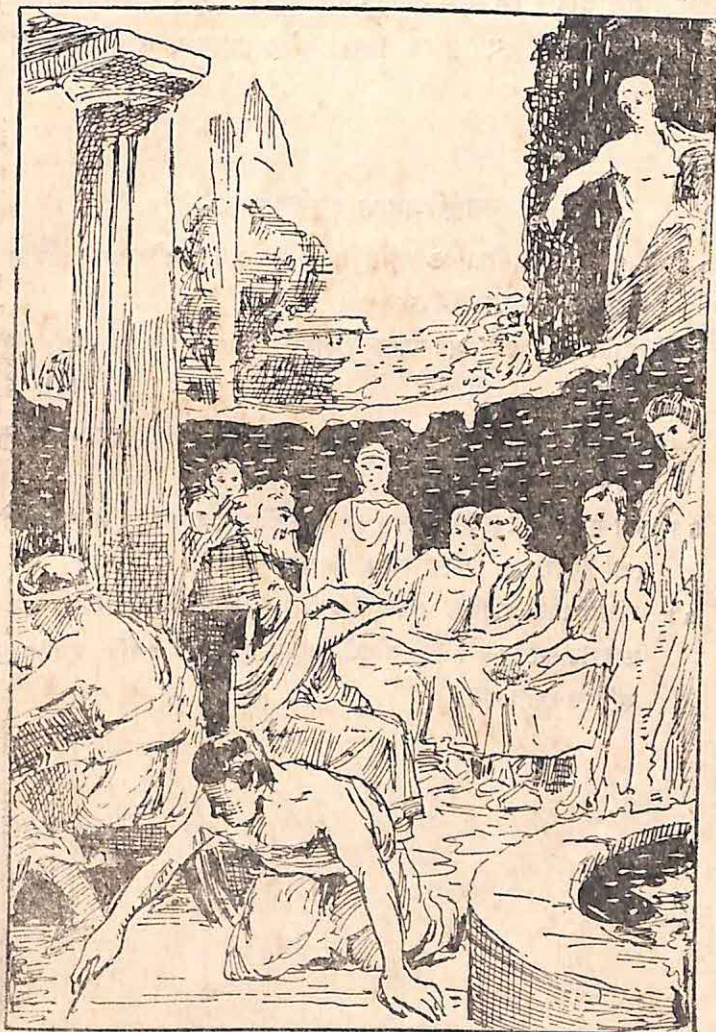
প্লেটো ও তাঁর শিষ্যগণ

পৃথিবীর পরবর্তী যুগের লোকেরা গ্রীশের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। গ্রীক্ সভ্যতাকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা। সে যুগে গ্রীক্ মনীষীরা যে সুন্দর সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি ক'রে গেছেন, যে সুন্দর চিন্তা ক'রে গেছেন, তার ফলে পৃথিবী হ'য়েছে সুন্দরতর।

অনুশীলন ও করণীয় কাজ

১। মিশর, বাবিলনীয়া ও আসিরীয়ার মত সমগ্র গ্রীশ জুড়ে একটা রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠতে পারেনি কেন?

২। স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি পছন্দ কর? কারণ দেখাও।

৩। পেরিক্লিস্ কে ছিলেন? পেরিক্লিসের যুগ ইতিহাসে এত বিখ্যাত কেন?

৪। সে যুগের এথেন্সের কয়েকজন মনীষীর নাম কর। এঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান বল।

৫। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে সক্রেটিসের কোন সহজ জীবনী নিয়ে পড়। তারপর কয়েকজন মিলে তাঁকে নিয়ে ছোট একটি নাটক রচনা ক'রতে চেষ্টা কর।

কাল-রেখা

খ্রীষ্ট পূর্ব

অভিজাত-তন্ত্র

৭০০		গ্রীশে রাজতন্ত্রের অবসান ও অভিজাত-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
৬০০		
৫০০		অধিকাংশ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
	৪৬০-২৯	পেরিক্লিসের যুগ
৪০০		সক্রেটিসের মৃত্যু
	৩৪৭	প্লেটোর মৃত্যু
	৩২২	এরিষ্টটলের মৃত্যু
৩০০		

পারস্য সাম্রাজ্য
সিথিয়া
শক
বসফোরাস
লিডিয়া
আর্মেনিয়া
সমরখন্দ
ব্যাক্ট্রিয়া
পার্থিয়া
মিডিয়া
নিনেভ
সুসা
পার্সিপোলিস
পারস্য
ভারতবর্ষ
আরব
মিশর
মেম্ফিস
দামাস্ক

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পারশ্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও গ্রীশ-জয়ের চেষ্টা

প্রাচীনকালে ইরাণে আর্যদের বসতি স্থাপনের কথা আগেই শুনেছ। এই ইরাণী আর্যদের আবার নানা দল। তার মধ্যে প্রধান ছিল মিডীয় ও পারশিকরা। মিডীয়দের বাস ছিল ইরাণের উত্তর-পশ্চিম অংশে যাকে বলা হ'ত মিডীয়া (বর্তমান আজের-বাইজান প্রদেশ)। আর পারশিকরা দখল ক'রেছিল ইরাণের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ।

মিডিয়া :—এদের মধ্যে মিডিয়গণই প্রথম সভ্য হয়ে উঠেছিল। মিডীয়দের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে খ্রীঃ পূঃ নবম শতকে যে তারা আসিরীয়দের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল সে কথা জানা যায়। এই মিডিয়ারই একজন রাজা বাবিলনীয়ার কালদীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আসিরীয় রাজধানী নিনেভে নগর ধ্বংস ক'রেছিলেন।

পারশ্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা :—মিডীয় সাম্রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। প্রথমে পারশিকরা ছিল তাদের অধীন ; কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে তারা প্রবল হ'য়ে উঠল। অবশেষে পারশিক নেতা সাইরাস্ মিডীয়দের হারিয়ে দিয়ে মিলিত পারশ্য-সাম্রাজ্যের পত্তন ক'রলেন (খ্রীঃ পূঃ ৫৫০)

এর পর সাইরাস্ রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। ৫০ বছর পূর্বেই আসিরীয়ার পতন হ'য়েছে। সম্রাট নেবু কাদনেজারের মৃত্যুর পর

বাবিলন হতবল ; মিশরেরও আর সে প্রতাপ নেই। কাজেই নব বলে বলীয়ান সাইরাসের গতি রোধ করার মত শক্তি কারো ছিল না। কেবল এশিয়া মাইনরে লিডিয়া রাজ্যই যা কিছু শক্তিশালী ছিল। শীঘ্রই তিনি লিডিয়া ও বাবিলন অধিকার ক'রে ক্রমে পূর্বদিকে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন। এভাবে সারা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে স্থাপিত হ'ল পারশ্য-সাম্রাজ্য। সম্রাট সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বাইসিজ মিশর জয় করেন।

সম্রাট দেরায়াস্ :—পারশ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ছিলেন দেরায়াস্। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্য হ'ল আরো শক্তিশালী। পূর্বদিকে পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, আর উত্তরে দানিয়ুব, ককেসাস ও কাস্পিয়ান অঞ্চল থেকে দক্ষিণে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন তিনি। আসিরীয়দের মত পারশ্য সম্রাটরা বিজিত জাতির প্রতি কখনো নিষ্ঠুর আচরণ করেন নি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ সম্রাটকে দিত কর, আর বিনিময়ে পেত শান্তি, শৃঙ্খলা, ও উদার শাসন। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তৈরী হ'য়েছিল বড় বড় রাজপথ। তার সাহায্যে দ্রুত সরকারী সংবাদাদি প্রেরণের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। সম্রাট দেরায়াস্ তাঁর ভারতীয় প্রদেশ থেকে কর স্বরূপ পেতেন প্রচুর সোনা, যার মূল্য আজকাল হবে দেড় কোটি টাকারও বেশী। তিনি নিজের বিজয়-কাহিনী বেহিস্তান নামক স্থানে একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে খোদাই ক'রে রেখে গেছেন।

গ্রীশের সহিত সংগ্রাম :—সাইরাস্ যখন লিডিয়া জয় করেন তখন এশিয়া মাইনরের উপকূলে গ্রীক্ নগরগুলিও পারশ্য সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারা এতে মোটেই সুখী ছিল না। সম্রাট দেরায়াসের সময় তারা করল বিদ্রোহ। এথেন্স নগরী তাদের সাহায্য করল। গ্রীক্‌রা হঠাৎ আক্রমণ ক'রে

পারসিকদের সার্ডিস নগর দিল পুড়িয়ে। দেরায়াস্‌ও এশিয়া মাইনরের গ্রীক্‌দের উপর নিলেন ভীষণ প্রতিশোধ।

কিন্তু এতেই তিনি নিরস্ত হ'লেন না। তিনি খাস গ্রীশ আক্রমণ করতে মনস্থ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এথেন্সকে সায়েস্তা ক'রে বিদ্রোহের মূল উৎপাটন করা। যাতে গ্রীশ জয়ের সংকল্প ভুলে না যান সেজন্য তাঁর আদেশে একজন ভৃত্য নাকি রোজ খাবার সময় তাঁকে বলত,—সম্রাট্‌! এথেনীয়দের কথা স্মরণ করুন।

মারাথনের যুদ্ধ:—সম্রাট দেরায়াস্‌ প্রথমে একে একে গ্রীক্‌ দ্বীপগুলি দখল ক'রে নিলেন। তারপর খ্রীঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে বহু জাহাজে ক'রে এক বিরাট বাহিনী এথেন্সের নিকট ***মারাথন*** নামক স্থানে অবতরণ করল। এথেনীয়রা তো ভীষণ ভড়কে গেল! কারণ পারশিকদের তখন ভয় ক'রত না এমন দেশ ছিল না। এথেনীয়রা তখন বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে স্পার্টায় ***ফাইডিপিডিস্‌*** নামে এক দূত

গ্রীক ও পারসিক যুদ্ধ

পাঠাল। ফাইডিপিডিস্‌ দৌড়ে ওস্তাদ! স্পার্টা সেখান থেকে প্রায় ১৪০ মাইল। ফাইডিপিডিস্‌ দু'দিন ক্রমাগত দৌড়ে স্পার্টায় গিয়ে পৌঁছিল। কিন্তু স্পার্টনরা বললে যে তারা পূর্ণিমার পূর্বে যাত্রা করতে পারবে না। পূর্ণিমার তখনো দেরী। তাই এথেনীয় দূতকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল।

গ্রীক্ সৈন্য ছিল মাত্র ১০ হাজার, কিন্তু পারশিকদের সংখ্যা ছিল এর চেয়ে অনেক বেশী। তাই প্রথমটা এথেনীয়গণ কি ক'রবে স্থির ক'রে উঠতে পারল না। অবশেষে তারা আর দেরী না ক'রে পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে এক সঙ্কীর্ণ প্রান্তরে শত্রুকে বাধা দিল। পারশিক তীরন্দাজরা ছিল বিখ্যাত। কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত তীর গ্রীক্‌দের লোহার শিরস্ত্রাণ ও বর্ম ভেদ ক'রতে পারল না। গ্রীক্‌রা প্রচণ্ড বেগে পারশ্য-সৈন্যের দু'পাশ দিয়ে আক্রমণ ক'রে সাঁড়াশীর মত চেপে ধ'রল এবং বর্শা চালিয়ে তাদের দলে দলে হত্যা করতে লাগল। তখন পারশিকরা আর সহ্য ক'রতে না পেরে পালিয়ে গিয়ে জাহাজে আশ্রয় নিল। দারুণ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তারা দেশে ফিরে গেল।

মারাথন দৌড় :—মারাথনের যুদ্ধে হেরে পারশিকরা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেই ফাইডিপিডিস্‌কেই পাঠান হ'ল এথেন্সে এই শুভ সংবাদ জানাতে। ফাইডিপিডিস্ প্রাণপণে ছুটল। নগর-দ্বারে পৌঁছেই সে চেঁচিয়ে বলল—'আনন্দ কর! যুদ্ধে আমরা জিতেছি।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এই ফাইডিপিডিসের স্মৃতিরক্ষার জন্যই অলিম্পিক খেলা-ধূলায় মারাথন দৌড়ের প্রবর্তন করা হ'য়েছে।

সম্রাট জার্কসীজের গ্রীস আক্রমণ :—এই পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার অল্পকাল পরেই দেরায়াস্ মারা গেলেন। তখন তাঁর পুত্র জার্কসীজ সিংহাসনে আরোহন ক'রলেন। তিনি আবার গ্রীশ জয়ের বিরাট আয়োজন শুরু ক'রলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য-সামান্ত সংগ্রহ ক'রে এক বিপুল বাহিনী সজ্জিত করা হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাজল বিরাট নৌ-বহর। সুদূর ভারতবর্ষ থেকেও একদল ভারতীয় সৈন্য পারশিকদের সঙ্গে যোগ দিল। পারশ্য

সম্রাটের মনে গর্ব ছিল যে তাঁর এই বাহিনী অক্ষয় অমর ; তাই এর নাম দিয়েছিলেন 'অমর বাহিনী'।

বিরাট স্থল-বাহিনী নিয়ে সম্রাট জার্কসীজ হেলেস্‌পণ্ট (আধুনিক দার্দানেলিস্) প্রণালীতে পৌঁছলেন। সেখানে বহু নৌকা পাশাপাশি জুড়ে সেতু তৈরী হয়েছিল। সৈন্যরা যখন সেতু পার হচ্ছিল তখন জার্কসীজ একটা পাহাড়ের চূড়ায় মর্মর-সিংহাসনে ব'সে সে দৃশ্য দেখছিলেন। হেরোডোটাস লিখেছেন :—

"সমস্ত হেলেস্‌পণ্ট জাহাজে ছেয়ে গেছে, এবিডিসের প্রান্তর লোকে লোকারণ্য ; সে দৃশ্য দেখে জার্কসীজ নিজেকে সুখী মনে করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কাঁদেতে লাগলেন। তাঁর পিতৃব্য আর্তাবান— যিনি জার্কসীজকে গ্রীশ অভিযান থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন —তিনি তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, 'একি রাজা! তোমার একি ভাবান্তর। এই কিছুক্ষণ আগেও তুমি আনন্দ প্রকাশ করছিলে আর এখনই চোখের জল ফেলছ!' সম্রাট বললেন, 'এ দৃশ্য দেখে হঠাৎ আমার মনে হ'ল মানুষের জীবন কত ক্ষণস্থায়ী। এই যে অগণিত মানুষ দেখছি, এরা তো একশ' বছর পরে কেউ জীবিত থাকবে না।'

থার্মপিলির যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ৪৮০) :—সেতু পার হয়ে পারশিক বাহিনী গ্রীশ আক্রমণে অগ্রসর হল। পাশাপাশি উপকূল ধরে চলল শত শত জাহাজ। এ বিপদের সময়ে এথেন্স, স্পার্টা ও অন্যান্য গ্রীক্ নগরী আত্মকলহ ভুলে একযোগে শত্রুর গতিরোধ করতে প্রস্তুত হল। স্পার্টানরাজ লিওনিডাস হলেন মিলিত বাহিনীর নেতা। পারশিকরা যখন উত্তর গ্রীশে উপস্থিত হল, তখন গ্রীক্‌রা থার্মপিলি নামক স্থানে তাদের ঠেকাতে চেষ্টা করল। সে স্থানটা হল একটা অতি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ—তার পশ্চিম দিক খাড়া পাহাড় আর পূর্বদিকে সাগর। গ্রীক্ সৈন্যরা ছিল পারশিকদের

তুলনায় মুষ্টিমেয়। খুব সামান্য সৈন্য নিয়ে এই সরুপথে বিরাট বাহিনীকে বাধা দিতে পারবে মনে করে তারা এস্থান বেছে নিয়েছিল। তিন দিন পর্যন্ত গ্রীক্‌রা এখানে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখল। এর পর এক গুপ্ত পথের সন্ধান পেয়ে পারশিকরা ঘুরে এসে গ্রীক্ সৈন্যের পেছন দিকে উপস্থিত হল। আর জয়ের আশা নাই দেখে অনেক গ্রীক্ সৈন্য দক্ষিণ গ্রীশ রক্ষা করতে চলে গেল। কিন্তু স্পার্টার রাজা লিওনিডাস মাত্র ৩০০ স্পার্টান বীরকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে সকলে প্রাণ দিলেন। কিন্তু মরেও তাঁরা অমর হয়ে আছেন। আজও থার্মপিলিতে লিওনিডাস ও তাঁর ৩০০ অনুচরের বাণী খোদিত রয়েছে *প্রস্তর ফলকে* :—

> "কে যাও তুমি, ওগো পথিক, ব'লোগো স্পার্টায়
> আজ্ঞায় তাদের মৃত্যু সে মোরা বরিনু হেথায়।"

সালামিসের নৌ-যুদ্ধ :—এর পর আর এথেন্স রক্ষা করা সম্ভবপর হল না। কোন কোন গ্রীক্ নগরী বশ্যতা স্বীকার করল। কিন্তু এথেন্সবাসীরা সকলে জাহাজে চড়ে পালিয়ে গেল। পারশিকরা জনমানবহীন নগরে প্রবেশ করে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। কিন্তু গ্রীক্ নৌ-বহর তখনও অক্ষত আছে। সালামিস দ্বীপ ও গ্রীশের মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ প্রণালীতে এক ভীষণ নৌ-যুদ্ধ হল। সারাদিন যুদ্ধের পর পারশ্য নৌ-বহর বিধ্বস্ত হয়ে গেল (খ্রীঃ পূঃ ৪৮০)। সম্রাট জার্কসীজ গ্রীশ জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পারশ্যে ফিরে গেলেন।

এই পরাজয়ের ফলে পারশ্যের ক্ষমতা যে বিশেষ কমে গেল তা নয়। আরো প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত পারশ্য সাম্রাজ্য অটুট ছিল।

এ যুদ্ধে জয়লাভ করার পর এথেন্সে যে স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছিল, সে কথা তোমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে প'ড়েছ।

অনুশীলনী

১। কি ভাবে বিরাট পারশ্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠল, সে গল্প সংক্ষেপে বল।

২। মারাথনের অথবা থার্মপিলির যুদ্ধের কাহিনী বল।

৩। সম্রাট জার্কসীজজের যে উক্তিটি এ গল্পে উদ্ধৃত হয়েছে, তা পড়। এ থেকে তাঁর সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয়?

কাল-রেখা

খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ			
৭০০	মিডীয় সাম্রাজ্য		
		৬১২	মিডীয় ও কালদীয়গণ মিলে নিনেভে ধ্বংস করে
৬০০			
		৫৫০	সাইরাস্ কর্তৃক পারশ্য সাম্রাজ্যের পত্তন
		৫২৮	" " বাবিলন অধিকার
	পারস্য সাম্রাজ্য	৫৩৫	ক্যাম্বাইসিজ কর্তৃক মিশর জয়
		৫২১	দেরায়াস সিংহাসনে আরোহণ করেন
৫০০			
		৪৯০	মারাথনের যুদ্ধ
		৪৮০	থার্মপিলি ও সালামিসের যুদ্ধ
		৪৬৫	জার্কসীজ নিহত হন
৪০০			

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের কথা

বৈদিক যুগের শেষের দিকে লোকে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ভুলে গিয়েছিল আর তার স্থান অধিকার ক'রেছিল যাগ-যজ্ঞ ও নীরস ক্রিয়াকাণ্ড। তাই বৈদিক ধর্মের প্রতি এক শ্রেণীর লোকের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। পূর্বভারতেই এ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন ক্ষত্রিয়। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে এরকম দু'জন ক্ষত্রিয় মহাপুরুষ যাগ-যজ্ঞ বাদ দিয়ে, সাধারণ লোকে বুঝতে পারে এমন ধর্মমত প্রচার ক'রতে আরম্ভ করেন। তাঁদের নাম ***বর্ধমান মহাবীর*** ও ***গৌতম বুদ্ধ***।

বর্ধমান মহাবীর:—জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীরের জন্ম হয় উত্তর বিহারে অবস্থিত বৈশালীর এক ক্ষত্রিয়কুলে। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ। মহাবীরের বাপ-মায়ের দেওয়া নাম বর্ধমান। বর্ধমানের বয়স হ'লে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল, কিন্তু সংসার তাঁকে বাঁধতে পারল না। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে গেলেন। বার বছর কঠোর তপস্যার পর তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেন। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি রিপু জয় ক'রে তিনি হ'লেন 'জিন' (বিজয়ী) বা 'মহাবীর'। এজন্য তাঁর ধর্মের নামও হ'য়েছে ***জৈনধর্ম***। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর মগধ, অঙ্গ, মিথিলা, কোশল প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করে মহাবীর ৭২ বৎর বয়সে পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

মহাবীর ব'লতেন যে, সৎকর্ম, আত্মসংযম ও জীবে দয়াই মুক্তি লাভের উপায়। জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বেদ মানে না, জাতিভেদও মানে না। অহিংসা ও ইন্দ্রিয়জয়ই এ ধর্মের সারকথা।

মহাবীর

বুদ্ধদেব

গৌতম বুদ্ধ :—গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মহাবীরের সমসাময়িক। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দে নেপালে তরাই-এর অন্তর্গত কপিলাবস্তুর শাক্যবংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা **শুদ্ধোদন** ছিলেন শাক্য জাতির নায়ক বা 'রাজা'। বুদ্ধের ছেলেবেলার নাম ছিল ***সিদ্ধার্থ***। তাঁর আর এক নাম ছিল 'গৌতম'।

গৌতম ছেলেবেলা থেকেই চিন্তাশীল ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাশীলতা ও আনমনাভাব বেড়েই চ'লল। তাঁর এই উদাসীন ভাব দেখে শুদ্ধোদন চিন্তিত হ'লেন। সংসারে সিদ্ধার্থের মন বসাবার জন্য তিনি মাত্র ষোল বছর বয়সে যশোধরা বা গোপা নামে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন ছিল অতি কোমল। সংসারে লোকের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। প্রবাদ আছে, নগর ভ্রমণে গিয়ে পর পর জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখে তিনি ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন। তিনি কেবল ভাবতে লাগলেন কি ক'রে মানুষ এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর স্নিগ্ধ সৌম্য কান্তি দেখে তিনি যেন পথের সন্ধান পেলেন। স্থির ক'রলেন, তিনিও সন্ন্যাসী হ'য়ে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজে বের ক'রবেন।

এই সময়ে সিদ্ধার্থের একটি ছেলে হল, তাঁর নাম রাহুল। সিদ্ধার্থের বয়স তখন ২৯ বছর। সংসারের বন্ধন বেড়েই যাচ্ছে দেখে তিনি একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেলেন মানুষের মুক্তির সন্ধানে।

সন্ন্যাসী হ'য়ে গৌতম গেলেন রাজগৃহে। সেখানে বড় বড় সাধুর আশ্রমে কত উপদেশ শুনলেন, কত শাস্ত্র পাঠ ক'রলেন, কিন্তু সত্যের সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি চ'লে গেলেন গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে। সেখানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক অশ্বত্থ গাছের মূলে ব'সে আহার-নিদ্রা ছেড়ে ছ' বছর কঠোর তপস্যায় কাটালেন। শরীর অস্থি-চর্মসার হ'ল কিন্তু কৈ, সিদ্ধিলাভ তো হ'ল না! তিনি বুঝলেন, মহান্ আদর্শ লাভের জন্য পবিত্র মন যেমন প্রয়োজন, সুস্থ দেহও তেমনি প্রয়োজন। এ সময়ে সুজাতা নামে এক ধনী গোয়ালার মেয়ে বনদেবতার পূজা করতে এসে গৌতমকে এক পাত্র মিষ্টান্ন খেতে দিলেন। সেই মিষ্টান্ন খেয়ে গৌতম শরীরে নূতন

বল পেলেন। তারপর নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান ক'রে এসে অশ্বত্থ-গাছের নীচে আরও গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সে রাত্রিতে তিনি দিব্য-জ্ঞান লাভ ক'রলেন। দিব্য-জ্ঞান বা 'বোধি' লাভ করায় তাঁহার নাম হ'ল 'বুদ্ধ', আর সে স্থানের নাম হল 'বোধগয়া'।

ধর্মপ্রচার ঃ—দিব্য-জ্ঞান লাভের পর বুদ্ধ বারাণসীর নিকটে মৃগদাব নামক স্থানে (বর্তমান সারনাথে) গিয়ে পাঁচজন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে প্রথমে উপদেশ দেন। এই হল তাঁর প্রথম ধর্ম-প্রচার। বুদ্ধের উপদেশ শুনে ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রলেন। তাঁরাই হলেন প্রথম বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা 'ভিক্ষু'। আর এ ভাবেই হল বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম প্রতিষ্ঠা।

এর পর বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কপিলবস্তু প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার ক'রতে লাগলেন। তাঁর কাছে জাতি-ভেদ ছিল না; উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধনে পার্থক্য ছিল না। অহিংসা ও করুণার অবতার এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কথা ছড়িয়ে প'ড়ল দিকে দিকে। দলে দলে লোক এসে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ দিতে লাগল। স্থানে স্থানে গড়ে উঠল বৌদ্ধ মঠ। বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। তবে সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেই তাঁর ধর্মের প্রসার হ'য়েছিল বেশী। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মগধের রাজা ক্ষত্রিয় **বিম্বিসার**, বৈশ্য **অনাথপিণ্ডদ**, ব্রাহ্মণ **সারিপুত্ত** ও **মোগ্‌গলান** আর দীন হীন **আনন্দ** ও **উপালি**। প্রায় ৪৫ বৎসর ধর্মপ্রচার ক'রে ৮০ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব কুশীনগরে (বর্তমান গোরক্ষপুর জেলায়) প্রাণত্যাগ করেন (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৮৩)।

বুদ্ধের শিক্ষা ও বাণী—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বুদ্ধদেব কোন কথা বলেন নি। তাঁর ধর্ম ছিল সহজ ও সরল। অতিরিক্ত ভোগ-সুখ

আর উগ্র তপস্যা—এ দু'টোর কোনোটাই তিনি পছন্দ ক'রতেন না। তিনি বলতেন, একটা মধ্যপথ ধ'রে মানুষের চলা উচিত। মধ্যপথে চলার জন্য তিনি আটটি নীতির উপর জোর দিতেন। তাঁর মতে সম্যক দৃষ্টি, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ সংকল্প, সৎ চেষ্টা (অর্থাৎ সৎচিন্তা), সৎ জীবন, সৎ স্মৃতি ও সম্যক সমাধি—এই আটটি নীতি যথাযথ পালন ক'রলেই মুক্তি বা নির্বাণ লাভ হয়। অহিংসাকে তিনি পরম ধর্ম মনে ক'রতেন। তিনি প্রচার ক'রতেন যে, যাগযজ্ঞে পশু বলি দিলে অথবা ব্রত-উপবাসে শরীরকে অনর্থক কষ্ট দিলে কোন লাভ হয় না, তাতে মুক্তি মেলে না। সত্য কথা ব'ললে, জীবহিংসা না ক'রলে আর কায়মনোবাক্যে পবিত্র হলেই লোকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

বুদ্ধদেব জনসাধারণের বোধগম্য পালি ভাষায় মুখে মুখে উপদেশ দিতেন। তাঁর নির্বাণ লাভের পর রাজগৃহে তাঁর ৫০০ শিষ্য মিলিত হ'য়ে তাঁর উপদেশসমূহ পালিভাষায় সঙ্কলন করেন। এই বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত; এজন্য এর নাম **'ত্রিপিটক'** অর্থাৎ তিনটি পেটিকা।

জাতকের গল্প—বৌদ্ধদের বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বে বুদ্ধের আরো বহু জন্ম হ'য়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে বুদ্ধ কোথায় জন্মেছিলেন, কি করেছিলেন সে কাহিনীকে বলে জাতক। ত্রিপিটকের অনেক পরে এ'সব জাতকের গল্প রচিত হয়েছিল। জাতকের গল্পগুলি অতি সুন্দর।

অনুশীলনী

১। বুদ্ধদেবের ছেলেবেলার নাম কি? তাঁর বাল্যকালের গল্প বল।

২। বুদ্ধদেব ও মহাবীরের জীবন ও ধর্মের মধ্যে কি সাদৃশ্য দেখতে পাও?

৩। বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের নাম কর। তাঁর ধর্মের মূল কথা কি? এই ধর্ম জনসাধারণের মধ্যে এত ছড়িয়ে পড়েছিল কেন?

৪। জাতকের গল্প কাকে বলে?

নবম পরিচ্ছেদ

কনফুসিয়স্

আমাদের দেশে যখন মহাবীর ও বুদ্ধদেব জ্ঞানের আলো বিতরণ ক'রছিলেন, তখন চীনদেশেও কয়েকজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন **কনফুসিয়স্**। তাঁর জন্ম হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে।

সে সময়ে চীনের অবস্থাঃ—আগেই বলেছি, তখন চীনে চৌ-বংশের রাজত্ব চ'লছে, কিন্তু সে নামে মাত্র। উত্তর-পশ্চিম দিকের তাতার জাতীয় বর্বরদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে চৌ-রাজারা

দক্ষিণ প্রান্তে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখন সারা দেশ জুড়ে ছোট বড় বহু স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য হ'য়েছে। এরা প্রাধান্য লাভের জন্য পরস্পারের সঙ্গে সর্বদা মারামারি ক'রছে। তার উপর বর্বরদের আক্রমণে দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। নীতি-ধর্ম ভুলে গিয়ে রাজা-প্রজা সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ-সাধনে ব্যস্ত। অত্যাচারে অনাচারে সাধারণ লোকের দুর্দশার অন্ত নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে গৌতম বুদ্ধ যেমন মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, কনফুসিয়স্‌ও তেমনি দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে ভাবতে লাগলেন, কি ক'রে দেশের লোকের চরিত্র উন্নতি করে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন।

বাল্যকাল ও শিক্ষা :—কনফুসিয়স্‌ ছিলেন উত্তর-চীনের লোক। শাণ্টুং প্রদেশের লু-রাজ্যে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরেই তাঁর জন্ম। কিন্তু বড় ঘরের ছেলে হলেও মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। মায়ের সাহায্যের জন্য সেই ছোটবেলায় তাঁকে দারুণ পরিশ্রম করতে হ'ত। জ্ঞানের পিপাসা ছিল তাঁর অদম্য। তিনি নিজের চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম করে চীনের উচ্চ আদর্শে শিক্ষা লাভ করেন। চীনের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত, সব তিনি আগ্রহের সাথে পড়তেন। ধনুর্বিদ্যাও শিখেছিলেন তিনি। মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের মত তিনি ও নাকি দেখতে খুব কদাকার ছিলেন। কনফুসিয়সের পিঠ দেখে তাঁকে নাকি মনে হত একটা ড্রাগন, ঠোঁট দেখে মনে হত যেন একটা ষাঁড়, আর মুখের গহ্বরটা নাকি ছিল সমুদ্রের মত।

শিক্ষাদান :—১৭ বছর বয়সে তিনি সরকারী চাকুরি নেন। কিন্তু বিদ্যার প্রতি ছিল তাঁর অসীম অনুরাগ। কিছুদিন পর তিনি নিজের বাড়ীতেই বিদ্যালয় খুলে ব'সলেন। সামান্য দক্ষিণা নিয়ে তিনি ছাত্রদের ইতিহাস, কাব্য আর ভদ্র ব্যবহার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিতেন। আমাদের

দেশে পুরাকালে শিষ্যেরা যেমন গুরু-গৃহে লেখা-পড়া শিখত, তেমনি কনফুসিয়সেরও কিছু শিষ্য তাঁর বাড়ীতে থেকে শিক্ষা লাভ করত।

জ্ঞানের সাধনায় ও শিক্ষাদান কার্যে তিনি লু-রাজ্যে বহু দিন কাটালেন। দেশময় দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি তাঁর হৃদয়ে গভীর বেদনার সৃষ্টি ক'রেছিল। তিনি বিশ্বাস ক'রতেন যে দেশবাসী সকলে যদি চীনের প্রাচীন মহাপুরুষদের আদর্শে জীবন গ'ড়ে তোলে, তাহলেই দেশে আবার ফিরে আসবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। এই আদর্শই তিনি তুলে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু লোক আসতে লাগল তাঁর কাছে জ্ঞানলাভের জন্য। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

শাসনকার্যে সাফল্য ঃ—অবশেষে তাঁর বয়স যখন ৫১ বৎসর, তখন লু-রাজ্যের অধিপতি তাঁকে একটি শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি মন্ত্রিপদেও নিযুক্ত হন। আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার প্রভৃতি জীবনের সকল কাজে লোকে যাতে সভ্য ও ভদ্র হয়ে ওঠে, এই উদ্দেশ্যে কনফুসিয়স্ নানা রকম নিয়ম-কানুন বেঁধে দেন। তাঁর প্রভাবে রাজ্য থেকে চুরি-ডাকাতি, প্রবঞ্চনা দূর হ'য়ে গেল। লোকের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়তে লাগল। এ দেখে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির হ'ল হিংসা। তাদের চক্রান্তে কনফুসিয়স্‌কে লু-রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল।

নানা রাজ্যে ভ্রমণ ঃ—এর পর তিনি শিষ্যদের নিয়ে ১৪ বছর ধরে নানা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে উপদেশ দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোন রাজাই তাঁর উপদেশমত রাজ্য শাসন করতে রাজী হলেন না। তিনি আবার লু-প্রদেশে ফিরে এলেন অন্তর-ভরা নিরাশা নিয়ে।

কনফুসিয়সের শিক্ষা ঃ—এর কিছুদিন পর খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দে কনফুসিয়স্ দেহত্যাগ করেন। ধর্ম-প্রবর্তক বলতে যা বুঝায়,

কনফুসিয়স্ ঠিক তা ছিলেন না। তিনি কতকগুলি নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর এ সকল নীতি শিক্ষা দিত—কোন্ কাজ করা উচিত, কোন্ কাজ করা অনুচিত। তিনি কাকেও সংসার ছেড়ে যেতে বলেন নি। তিনি চেয়েছিলেন সমাজকে উন্নত করে লোকের দুঃখের অবসান করতে। তিনি যে কত বড় জ্ঞানী ও লোকহিতৈষী ছিলেন, চীনারা তাঁর মৃত্যুর পরে তা বুঝতে পেরেছিল। কাজেই তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি। চীনারা তাঁর বাণী মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রেছে। চীনারা যে এত ভদ্র, এত মার্জিত-রুচি, শিক্ষা-দীক্ষায় এত উন্নত, তার মূলে রয়েছে কনফুসিয়সের শিক্ষা। আজও চীনারা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করে।

অনুশীলনী

১। বুদ্ধদেব ও কনফুসিয়সের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাও কি? প্রভেদই বা কি?

২। কনফুসিয়সের শিক্ষা কি? তাঁকে চীনারা এখনও এত ভক্তি করে কেন?

৩। সুশাসন বলতে কি বুঝায়—একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে কনফুসিয়স বলেছিলেন—"সোজা কথায় এর অর্থ হল মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা উচিত, তা রক্ষা করে চলা। প্রজার প্রতি রাজার খাঁটি রাজোচিত আচরণ, আর রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য, পুত্রকন্যার প্রতি পিতার স্নেহ, আর পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি ও কর্তব্যবোধ—এগুলি থাকলেই রাজ্যে সুশাসন স্থাপিত হয়।"

এ থেকে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে কি ধারণা হয়?

আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়
ও সাম্রাজ্য
অভিযানের পথ
সাম্রাজ্য – সাদা অংশ
জেরুজালেম
বাবিলন
সুসা
পার্সিপোলিস
আরবেলা
একবাটানা
পার্থিয়া
ব্যাক্ট্রিয়া
(হিরাট)
সোগডিয়ানা
(সমরখন্দ)
মেম্ফিস

দশম পরিচ্ছেদ

আলেকজাণ্ডার, পুরুরাজ ও চন্দ্রগুপ্ত

আমরা দেখেছি খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিম এশিয়া থেকে পারস্যের সম্রাট্‌গণ গ্রীশ আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু জয় করতে পারেন নি। এর প্রায় ১৫০ বছর পর একজন গ্রীক্‌ বীর উল্টো আক্রমণ করে এশিয়ার এক বিরাট অংশ জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি হলেন মাসিডনের অধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডার।

মাসিডনরাজ ফিলিপ :—গ্রীশ দেশের উত্তর প্রান্তে মাসিডন। মাসিডনের অধিবাসীরা গ্রীক্‌দেরই জ্ঞাতি। আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মাসিডন ছিল ছোট একটি রাজ্য। কিন্তু রাজা হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গ্রীক্‌ আদর্শে এক অতি সুশিক্ষিত সেনাদল গড়ে তুললেন। তখন এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি গ্রীক্‌ নগরগুলি

ফিলিপ

আত্মকলহে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফিলিপ এ সুযোগে তাঁর সুগঠিত সেনাদল নিয়ে সমগ্র গ্রীশ জয় ক'রে ফেললেন। কিন্তু এখানেই থামবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর দৃষ্টি ছিল আরো দূরে। তিনি সমগ্র গ্রীক্ জাতির নেতৃত্ব ক'রে পারশ্য সাম্রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা ক'রলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা অসম্পূর্ণই র'য়ে গেল।

আলেকজাণ্ডার ঃ—পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২০ বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩৩৬)। ফিলিপ পুত্রের

আলেকজাণ্ডার

উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটলকে তাঁর গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। যেমনি মহাজ্ঞানী গুরু তেমনি প্রতিভাশালী শিষ্য। আলেকজাণ্ডার এরিস্টটলের নিকট

চার বছর নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। পিতার সঙ্গে থেকে তিনি যুদ্ধ-বিদ্যাও শিখেছিলেন চমৎকার। এই শিক্ষার ফলে যুবক আলেকজাণ্ডার হ'য়ে উঠেছিলেন পিতার মতই উচ্চাভিলাষী।

ছেলেবেলা থেকেই আলেকজাণ্ডারের সুন্দর চেহারা, শক্তি ও সাহস দেখে সকলে তাঁকে ভালবাসত। চেহারার মধ্যেও তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। চোখ দুটো উজ্জ্বল, কপাল বেশ চওড়া, নাক বাঁকা ও সুগঠিত, চিবুকে দৃঢ়তার ছাপ, আর মাথাভরা সুন্দর কোকড়ান চুল। যখন কোন চিন্তা ক'রতেন বা কারো কথা শুনতেন, তখন মাঝে মাঝে তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠত আর মাথাটা বাঁ দিকে একটু ঝুঁকে থাকত। তাঁর মৃত্যুর বহু পরেও ইউরোপের অনেক রাজাই নাকি তাঁর এই ধরনগুলোর নকল ক'রতেন।

দিগ্বিজয় ঃ—সিংহাসনে বসে আলেকজাণ্ডার এশিয়া আর ইউরোপ জুড়ে এক মিলিত সাম্রাজ্য স্থাপনের বলিষ্ঠ কল্পনায় মেতে উঠলেন। ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি পারস্যে অভিযান ক'রলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪)। হেলেস্পণ্ট বা দার্দানেলিস প্রণালী পার হয়ে তিনি সমুদ্রের কূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'লেন। পারশ্য সাম্রাজ্য তখন কত বিশাল, অগণিত তার সেনাবল। তবুও সম্রাট্ দরায়াস পর পর দুটো যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। এর পর সিরিয়ার প্রাচীন ফিনিশীয় বন্দর টায়ার ও সিডন অধিকার করে আলেকজাণ্ডার গোটা মিশর জয় করে ফেললেন এবং নীল নদের মোহনায় বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন করলেন।

এবার আলেকজাণ্ডার পারশ্যের মর্মস্থলে আঘাত হানলেন। প্রাচীন নিনেভের নিকট আরবেলার ভীষণ যুদ্ধে দরায়াস পরাস্ত হয়ে পলায়ন করলেন, কিন্তু নিজের অনুচরদের হাতে নিহত হলেন

(খ্রীঃ পূঃ ৩৩১)। এর পর আলেকজাণ্ডার পারশ্যের রাজধানী পার্শিপোলিস্ দখল ক'রলেন এবং সম্রাটের রাজ-প্রাসাদটি পুড়িয়ে দিয়ে এথেন্স-ধ্বংসের প্রতিশোধ নিলেন। এভাবে পারশ্য অধিকার
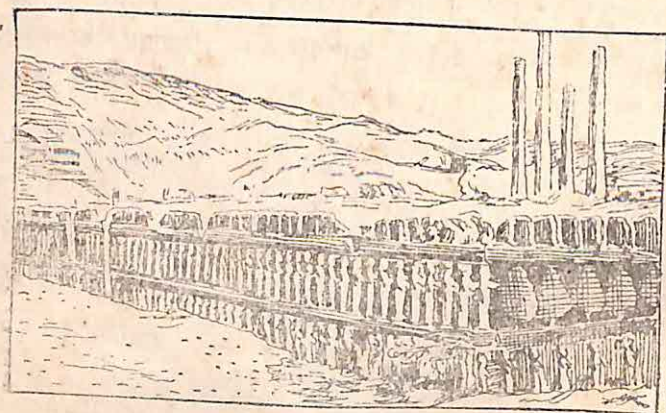
পার্শিপোলিসে সম্রাট্ জার্কসীজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

ক'রেও গ্রীক্‌রাজের রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হল না। তিনি বরাবর উত্তরে ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন এবং ক্রমে হিন্দুকুশ পর্বত ডিঙিয়ে ভারতের প্রবেশ ক'রলেন।

ভারত আক্রমণঃ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য জাতি-গুলিকে দমন করে পর বৎসর তিনি পঞ্জাবে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬) উপস্থিত হলেন। পঞ্জাব তখন কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ও জনপদে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল সিন্ধুর পূর্ব তীরে বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে তক্ষশীলা রাজ্য আর বিপাশা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যস্থ প্রাচীন পুরু-বংশীয় এক রাজার রাজ্য। তখন তক্ষশীলার রাজা ছিলেন **অম্ভি**। পুরুরাজের প্রতি তাঁর ছিল দারুণ হিংসা। আলেকজাণ্ডার সিন্ধু অতিক্রম করে যখন তক্ষশীলার দিকে অগ্রসর হলেন তখন রাজা অম্ভি যুদ্ধ করা তো

দূরের কথা, বিদেশী শত্রুকে আদর অভ্যর্থনা করলেন এবং সৈন্যাদি দিয়ে তাঁর সাহায্য করতে লাগলেন। পুরুরাজ কিন্তু বিনাযুদ্ধে কিছুতেই মাথা নোয়ালেন না। বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম সাহসের সহিত
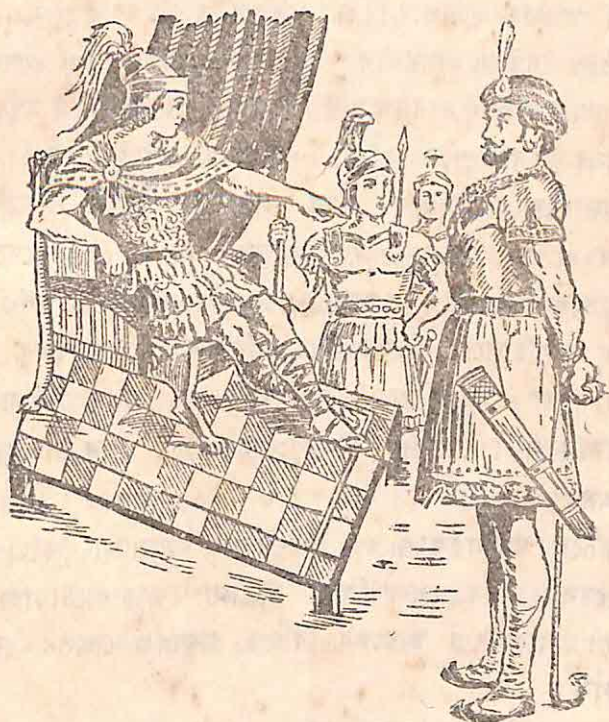
পুরুরাজ ও আলেকজাণ্ডার

গ্রীক্‌রাজের গতিরোধ করলেন। এইখানেই গ্রীক্ সৈন্য যুদ্ধে সর্বপ্রথম হাতীর সম্মুখীন হ'ল। যুদ্ধের প্রথমে পুরুরাজের হাতীগুলি গ্রীক্ সৈন্যের মনে ত্রাসের সঞ্চার ক'রলেও শেষ পর্যন্ত গ্রীক্‌রাই জয়লাভ করল। পুরুরাজ বন্দী হলেন। তাঁকে যখন আলেকজাণ্ডারের নিকটে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন গ্রীক্ বীর

জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্দী, তুমি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার আশা কর ?" পুরুরাজ সগর্বে উত্তর দিলেন, "রাজার মত।" গ্রীক্ বীর পুরুরাজের সাহস ও মর্যাদা-জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হলেন এবং রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন।

এর পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হ'লেন। এখানে এসে তাঁর সৈন্যগণ আর কিছুতেই এগুতে চাইল না। পুরুরাজের বিক্রমে তারা আগেই দমে গিয়েছিল। তার উপর পূর্ব দিকে মগধরাজের পরাক্রমের কথা শুনে তা'রা একেবারে বেঁকে বসল। তখন আলেকজাণ্ডার বাধ্য হয়ে ফিরে চললেন। বিতস্তা নদীতে গিয়ে জলপথে ও স্থলপথে সমুদ্রকূলে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে এক সেনাপতিকে সমুদ্র-পথে পারশ্যে যেতে আদেশ দিয়ে তিনি নিজে সসৈন্যে বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়ে বাবিলনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরে যাওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। বাবিলনেই জ্বরাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর।

অচিরে আলেকজাণ্ডারের নব-বিজিত সাম্রাজ্য টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। তাঁর সেনাপতিরা সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলেন। পারস্য ও ভারতের বিজিত রাজ্যখণ্ড পেলেন সেনাপতি **সেলুকাস্**।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ—আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাব আক্রমণ করেন তখন মগধে রাজত্ব করছিলেন নন্দবংশীয় রাজারা। তাঁদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। তখন সেখানে **চন্দ্রগুপ্ত** নামে এক সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবক বাস করতেন। বোধ হয় তিনি নন্দরাজেরই কোন আত্মীয় ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক, রাজার কোপে পড়ে চন্দ্রগুপ্ত চলে গেলেন তক্ষশীলায়। সেখানে তিনি গ্রীক শিবিরে থেকে গ্রীকদের যুদ্ধ-কৌশল শিখতে থাকেন। কিন্তু শেষে আলেক-

জাণ্ডারের বিরাগভাজন হওয়ায় তিনি নাকি প্রাণভয়ে বিন্ধ্য পর্বতের জঙ্গলে আশ্রয় নেন।

পঞ্জাব ও মগধ জয় :—তক্ষশীলায় থাকতেই চাণক্য নামে এক চতুর ব্রাহ্মণের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় হয়েছিল। তক্ষশীলার এই ব্রাহ্মণের আর এক নাম কৌটিল্য। এক সময়ে নন্দরাজ কর্তৃক তিনি নাকি অপমানিত হয়েছিলেন। প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে মিলিত হলেন। সেখানে তাঁরা এক সেনাদল গড়ে তুললেন। এদিকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ পঞ্জাবে পৌঁছলে পর ভারতীয়েরা ক'রল বিদ্রোহ। তখন চন্দ্রগুপ্ত হিন্দুদের নায়ক হয়ে গ্রীক্ সৈন্যদের ধ্বংস করে ফেললেন এবং পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ হস্তগত ক'রলেন। এর পর চন্দ্রগুপ্ত কূট-নীতিবিদ্ চাণক্যের মন্ত্রণাবলে নন্দরাজকে বধ করে মগধের সিংহাসনও অধিকার ক'রলেন। এভাবে চন্দ্রগুপ্ত হ'লেন মগধের সম্রাট্ আর চাণক্য হ'লেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। সেই থেকে মৌর্য-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হল। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা বা পিতামহীর নাম ছিল 'মুরা', আর এই 'মুরা' নাম থেকেই তাঁর বংশের নাম হয়েছে মৌর্য বংশ। আবার কেহ কেহ মনে করেন, চন্দ্রগুপ্ত 'মৌর্য' নামক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মেছিলেন বলে তাঁর বংশের এ নাম হয়েছে।

সেলুকাসের সহিত যুদ্ধ :—অল্পকাল পরেই চন্দ্রগুপ্তকে আবার গ্রীক্‌দের সঙ্গে লড়তে হ'ল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি সেলুকাস্ পশ্চিম এশিয়ার অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি পঞ্জাব পুনরধিকারের জন্য সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সন্ধি ক'রতে বাধ্য হ'লেন। এই সন্ধির ফলে সেলুকাস পঞ্জাব তো হারালেনই, অধিকন্তু কাবুল, কান্দাহার আর হিরাটও চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দিতে হ'ল। সেলুকাসের

জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্দী, তুমি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার আশা কর ?" পুরুরাজ সগর্বে উত্তর দিলেন, "রাজার মত।" গ্রীক্ বীর পুরুরাজের সাহস ও মর্যাদা-জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হলেন এবং রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন।

এর পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হ'লেন। এখানে এসে তাঁর সৈন্যগণ আর কিছুতেই এগুতে চাইল না। পুরুরাজের বিক্রমে তারা আগেই দমে গিয়েছিল। তার উপর পূর্ব দিকে মগধরাজের পরাক্রমের কথা শুনে তা'রা একেবারে বেঁকে বসল। তখন আলেকজাণ্ডার বাধ্য হয়ে ফিরে চললেন। বিতস্তা নদীতে গিয়ে জলপথে ও স্থলপথে সমুদ্রকূলে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে এক সেনাপতিকে সমুদ্র-পথে পারশ্যে যেতে আদেশ দিয়ে তিনি নিজে সসৈন্যে বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়ে বাবিলনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরে যাওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। বাবিলনেই জ্বরাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর।

অচিরে আলেকজাণ্ডারের নব-বিজিত সাম্রাজ্য টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। তাঁর সেনাপতিরা সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলেন। পারস্য ও ভারতের বিজিত রাজ্যখণ্ড পেলেন সেনাপতি **সেলুকাস্**।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য :—আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাব আক্রমণ করেন তখন মগধে রাজত্ব করছিলেন নন্দবংশীয় রাজারা ; তাঁদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। তখন সেখানে **চন্দ্রগুপ্ত** নামে এক সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবক বাস করতেন। বোধ হয় তিনি নন্দরাজেরই কোন আত্মীয় ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক, রাজার কোপে পড়ে চন্দ্রগুপ্ত চলে গেলেন তক্ষশীলায়। সেখানে তিনি গ্রীক শিবিরে থেকে গ্রীকদের যুদ্ধ-কৌশল শিখতে থাকেন। কিন্তু শেষে আলেক-

জাণ্ডারের বিরাগভাজন হওয়ায় তিনি নাকি প্রাণভয়ে বিন্ধ্য পর্বতের জঙ্গলে আশ্রয় নেন।

পঞ্জাব ও মগধ জয়ঃ—তক্ষশীলায় থাকতেই চাণক্য নামে এক চতুর ব্রাহ্মণের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় হয়েছিল। তক্ষশীলার এই ব্রাহ্মণের আর এক নাম কৌটিল্য। এক সময়ে নন্দরাজ কর্তৃক তিনি নাকি অপমানিত হয়েছিলেন। প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে মিলিত হলেন। সেখানে তাঁরা এক সেনাদল গড়ে তুললেন। এদিকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ পঞ্জাবে পৌঁছলে পর ভারতীয়েরা ক'রল বিদ্রোহ। তখন চন্দ্রগুপ্ত হিন্দুদের নায়ক হয়ে গ্রীক্ সৈন্যদের ধ্বংস করে ফেললেন এবং পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ হস্তগত ক'রলেন। এর পর চন্দ্রগুপ্ত কূট-নীতিবিদ্ চাণক্যের মন্ত্রণাবলে নন্দরাজকে বধ করে মগধের সিংহাসনও অধিকার ক'রলেন। এভাবে চন্দ্রগুপ্ত হ'লেন মগধের সম্রাট্ আর চাণক্য হ'লেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। সেই থেকে মৌর্য-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হল। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা বা পিতামহীর নাম ছিল 'মুরা', আর এই 'মুরা' নাম থেকেই তাঁর বংশের নাম হয়েছে মৌর্য বংশ। আবার কেহ কেহ মনে করেন, চন্দ্রগুপ্ত 'মৌর্য' নামক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মেছিলেন বলে তাঁর বংশের এ নাম হয়েছে।

সেলুকাসের সহিত যুদ্ধঃ—অল্পকাল পরেই চন্দ্রগুপ্তকে আবার গ্রীক্‌দের সঙ্গে লড়তে হ'ল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি সেলুকাস্ পশ্চিম এশিয়ার অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি পঞ্জাব পুনরধিকারের জন্য সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সন্ধি ক'রতে বাধ্য হ'লেন। এই সন্ধির ফলে সেলুকাস পঞ্জাব তো হারালেনই, অধিকন্তু কাবুল, কান্দাহার আর হিরাটও চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দিতে হ'ল। সেলুকাসের

কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হ'ল। বিনিময়ে তিনি গ্রীক্ রাজকে উপহার দিলেন ৫০০ হাতী। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এখন পশ্চিমে কাবুল ও আরব সাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও অর্থশাস্ত্র :—সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক্ দূতকে পাঠিয়ে দেন। তিনি অনেক-দিন চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভায় থেকে এদেশ সম্বন্ধে একখানি চমৎকার বই লিখেছিলেন। সে বই আর নেই, কিন্তু তার কিছু অংশ অন্যান্য গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছুদিন আগে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার গ্রন্থাগারে সংস্কৃতে লেখা 'অর্থশাস্ত্র' নামে একখানা বিচিত্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, চন্দ্র-গুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যই এ বই লিখেছিলেন এবং তাতে মৌর্যযুগের শাসন-প্রণালীর সঠিক বর্ণনা রয়েছে।

মেগাস্থিনিস বলেন যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে। এমন সুন্দর, সমৃদ্ধ ও বিশাল নগরী ভারতে আর ছিল না। এর দৈর্ঘ্য ছিল ন' মাইল আর প্রস্থ দু'মাইল। নগরীর চারিদিক ঘিরে ছিল গভীর পরিখা আর উঁচু কাঠের প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে ছিল ৬৪টি বিরাট সিংহদ্বার। চন্দ্রগুপ্তের রাজ-প্রাসাদ ছিল কাঠের তৈরী। তা হ'লেও এটি রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষা সুদৃশ্য ছিল। সম্প্রতি পাটনার নিকটে এই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। নগর-পরিচালনার জন্য অজেকালকার মত পাটলিপুত্রেও একটি পৌর-সভা ছিল। এর সভ্য ছিলেন ত্রিশ জন। তাঁরা পাঁচ জন করে ছ'টি সমিতিতে বিভক্ত হয়ে কাজের ভার নিতেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, রাজা 'মহাপাত্র' ও 'অমাত্য' উপাধি-ধারী রাজ-পুরুষদের সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা ক'রতেন। তাছাড়া

'মন্ত্রি-পরিষদ্' নামে একটি পরামর্শ-সভা রাজাকে মন্ত্রণা দিত। মৌর্যসাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সাধারণতঃ রাজ-কুমারগণ রাজ-প্রতিনিধিরূপে প্রদেশগুলি শাসন ক'রতেন। চন্দ্রগুপ্ত আর মন্ত্রী চাণক্য মিলে যে মৌর্য সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলেন, মোটামুটি এই ছিল তার রূপ। ভারতবর্ষে এত বড় সাম্রাজ্য পূর্বে আর কখনো হয় নি। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বছর রাজত্ব ক'রে প্রাণত্যাগ করেন।

অনুশীলনী ও করণীয় কাজ

১। আলেকজাণ্ডার এত সহজে পঞ্জাব জয় করতে পেরেছিলেন কেন?

২। চন্দ্রগুপ্ত কি ভাবে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন? তাঁর বংশের এ নাম হয়েছিল কেন?

৩। চাণক্য কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করেছিলেন? 'অর্থশাস্ত্র' সম্বন্ধে কি জান?

৪। সে কালের ভারতীয় ও গ্রীক অস্ত্র-শস্ত্রের ছবি আঁক।

৫। আলেকজাণ্ডার ও পুরু অথবা চন্দ্রগুপ্তের মগধ-জয় সম্বন্ধে ছোট ছেট নাটক রচনা কর। ক্লাশের সকলে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে নাটক লেখা, সাজসজ্জা তৈরী করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের ভার নাও এবং প্রয়োজন মত শিক্ষক মশাই-এর সাহায্য নাও। তারপর একদিন প্রধান শিক্ষক মশাইএর অনুমতি নিয়ে অভিনয় কর।

কাল-রেখা

খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ

শতক		খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ	ঘটনা
৪০০			
		৩৫৯	ফিলিপ মাসিদনের রাজা হন
		৩৩৮	ফিলিপের গ্রীস জয়
		৩৩৬	আলেকজান্দারের সিংহাসন লাভ
		৩৩১	আরবেলার যুদ্ধ
		৩২৬	ভারতবর্ষ আক্রমণ
	মৌর্য্য সাম্রাজ্য	?৩২২	চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা
৩০০			
		?২৯৮	বিন্দুসার মগধের রাজা হন
		?২৭৩	অশোকের সিংহাসনে আরোহণ
		?২৩২	অশোকের মৃত্যু
২০০			

একাদশ পরিচ্ছেদ

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক

এ পর্যন্ত তোমরা অনেক বড় বড় রাজা-মহারাজার কথা শুনেছ, এর পরেও আরো অনেকের কথা শুনবে। কিন্তু এবার যাঁর কথা ব'লতে যাচ্ছি, তাঁর মত মহৎ রাজা জগতে খুব কমই ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র **অশোক**। ইতিহাসের পাতায় কত রাজা-মহারাজা ও রাজাধিরাজের নাম ভিড় ক'রে আছে, তাঁদের মধ্যে অশোকের নাম চির-উজ্জ্বল হ'য়ে রয়ো [illegible] কন্ত অশোক কি কাজ

ক'রে এত বড় হ'য়েছেন ? কেন লোকে তাঁকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে শ্রদ্ধা করে ? সে কথাই এখন বলছি।

অশোকের সিংহাসন লাভ ঃ—চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। তারপর রাজা হন তাঁর ছেলে অশোক। প্রবাদ আছে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনের জন্য ভাইদের সঙ্গে অশোকের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনি কোন কোন ভাই-এর প্রাণ-নাশ করেন। এজন্য লোকে নাকি তাঁর নাম দিয়েছিল 'চণ্ডাশোক'। এ কথা কতদূর সত্য, তা' জোর ক'রে বলা যায় না ; তবে একথা ঠিক যে, অশোকের রাজ্যাভিষেক হ'য়েছিল পিতার মৃত্যুর চার বছর পরে।

কলিঙ্গ-জয় ঃ—রাজত্বের প্রথম ভাগে পিতা-পিতামহের মত অশোকও রাজ্য-বিস্তারে মন দেন। হিন্দু রাজাদের এই ছিল চিরাচরিত প্রথা। বর্তমান উড়িষ্যা অঞ্চলে তখন ছিল পরাক্রান্ত কলিঙ্গ রাজ্য। রাজ্যাভিষেকের আট বছর পরে অশোক ভীষণ যুদ্ধের পর কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধের রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা দেখে অশোক দুঃখে ও অনুতাপে অভিভূত হয়ে প'ড়লেন। মানুষের প্রতি সমবেদনায় তাঁর অন্তর ভ'রে গেল। তিনি একটি শিলা-লিপিতে নিজেই কলিঙ্গবিজয়ের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন যে, কলিঙ্গ যুদ্ধে দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী হয়, এক লক্ষ যুদ্ধে আহত হয়, আর তারও বহুগুণ লোক মারা যায়। এটা মহারাজের পক্ষে একটা গভীর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। এখন যদি তার শত ভাগের এক ভাগ, এমন কি সহস্র ভাগের এক ভাগ লোকেরও সে রকম দুর্দশা হয়, তবে তিনি মর্মাহত হবেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও প্রচার ঃ—কলিঙ্গবিজয় অশোকের জীবনে এক মস্ত বড় পরিবর্তন এনে দিল। তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, আর

কখনো যুদ্ধ ক'রবেন না। তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হ'লেন। 'দিগ্বিজয়' অর্থাৎ অস্ত্রবলে

দেশজয়ের পরিবর্তে '**ধর্মবিজয়**' অর্থাৎ প্রেম, অহিংসা ও ধর্ম প্রচার দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করাই হ'ল এখন থেকে তাঁর জীবনের আদর্শ। এখন থেকে আর যুদ্ধের ভেরী বাজবে না, বাজবে ধর্মের ভেরী।
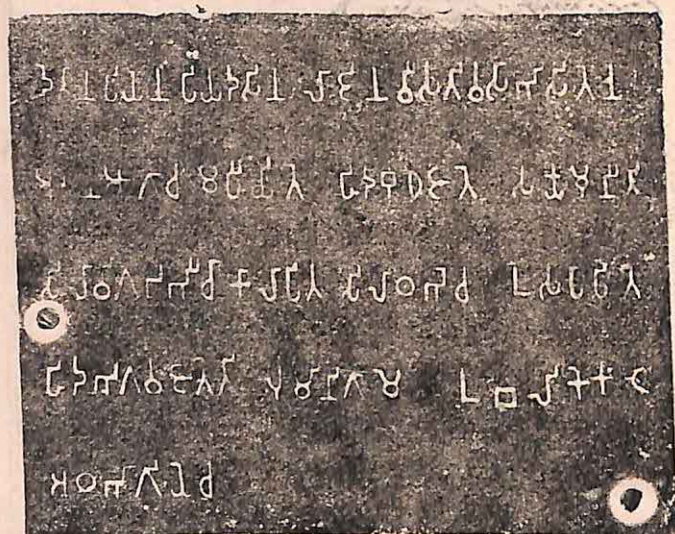
অশোকের শিলা-লিপি

তাই অশোক এখন বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে মন দিলেন। তিনি রাজ্য-মধ্যে নানাস্থানে বুদ্ধের সুন্দর সুন্দর বাণী ও নানা উপদেশ পাহাড়ের গায়ে বা থামে খোদিত করে দিলেন। এ সব শিলা-লিপি ও স্তম্ভ-লিপি আজও সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। এগুলিকে বলা হয় অনুশাসন বা 'ধর্মলিপি'। দেশের সাধারণ লোকেও যা'তে বুঝতে পারে সেজন্য এগুলি প্রায় সবই লেখা হ'য়েছিল সহজ সরল চল্‌তি ভাষায়। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, মৈত্রী, জীবে

দয়া, গুরুজন ও শিক্ষকের প্রতি ভক্তি, সত্য কথা বলা—এ সব সদ্‌গুণ শিক্ষা দেওয়াই ছিল এ সকল অনুশাসনের উদ্দেশ্য। আগে রাজারা আমোদ-প্রমোদ বা শিকার করতে বেরুতেন। অশোক তা' বন্ধ করে দিয়ে বুদ্ধের মৈত্রী ও অহিংসার বাণী প্রচারের জন্য 'ধর্ম-যাত্রা' আরম্ভ করলেন। এ ভাবে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তিনি স্বয়ং জনসাধারণের কাছে বুদ্ধের অমৃতবাণী প্রচার করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, প্রজাদের মধ্যে ধর্মনীতি প্রচারের জন্য তিনি '**ধর্ম মহামাত্র**' নামে এক শ্রেণীর নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করলেন।

অশোক নিজ রাজ্যে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না। ধর্মবিজয়ের জন্য তিনি দেশে দেশে প্রচারক পাঠাতে লাগলেন। তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য। অশোক এ সব রাজ্যে বুদ্ধের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। তাছাড়া নিজের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) **মহেন্দ্র** ও কন্যা **সঙ্ঘমিত্রাকে** পাঠালেন সিংহলে। শুনা যায়, তাঁরা নাকি গয়ার বোধি-বৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে গিয়ে সেখানে পুঁতেছিলেন। পূর্ব দিকে সুবর্ণভূমি (নিম্নব্রহ্ম), সুমাত্রা দ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও অশোকের প্রচারক গিয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। তিনি মধ্য-এশিয়া, মিশর, আফ্রিকা ও ইউরোপে পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

মানবহিতকর কাজঃ—অশোক ছিলেন আদর্শ নরপতি। ধর্মদানের সঙ্গে সঙ্গে সকল মানবের মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁর কাম্য। এ কাজে তিনি জাতি-ধর্ম বিচার করতেন না। তাঁর উদার দৃষ্টির সামনে সকলেই ছিল সমান। তিনি পথিকদের সুবিধার জন্য পথের ধারে ধারে বড় বড় গাছ রোপণ, কূপ খনন আর বিশ্রামাগার স্থাপন করেন ; জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল ও পশুদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। শুধু নিজের রাজ্যে নয়, অন্য রাজার রাজ্যেও তিনি

চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়েছিলেন। এমনি করে দেশে-বিদেশে কি মানুষ, কি পশু-পক্ষী—জীব মাত্রেই সমভাবে অশোকের দয়া লাভ করেছে। অশোকের আদর্শ-প্রচারের ফলে পশুহত্যাও অনেক কমে গিয়েছিল। রাজপ্রাসাদে আমিষ আহার নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রজার হিতের জন্য এমন নিরলস কর্মীও আর দেখা যায় না। তিনি বলেছেন—'আমি যখন যে অবস্থায় থাকি,—আহার-কালে, অন্দর-মহলে, শয়ন-কক্ষে, মন্ত্রণা-গৃহে, ভ্রমণকালে অথবা প্রাসাদের উদ্যানে—রাজ্যের সংবাদদাতারা এসে আমাকে প্রজাদের সংবাদ জানাবে।' মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে অশোক হয়েছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, কিন্তু রাজ-কার্যে কখনো অবহেলা করেন নি।

অশোকস্তম্ভ

শিল্পের উন্নতি—অশোকের সময়ে শিল্পেরও আশ্চর্য উন্নতি হয়েছিল। অশোকের ৮০০ বছর পর চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রে অশোকের পাথরের তৈরী রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে এ-যে মানুষের তৈরী তা বিশ্বাস করতে পারেন নি। অশোক বহু স্তূপ ও প্রস্তর-স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। সারনাথ, বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী প্রভৃতি স্থানে অশোক-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্তম্ভগুলি এমন সু র ও মসৃণ আর এদের চূড়ায় পশুর মূর্তিগুলি এমন জীবন্ত ও নিখুঁত যে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সারনাথের সিংহ-চূড়া তো বিশ্ববিখ্যাত। এই চূড়ার 'অশোকচক্র' আমাদের জাতীয় পতাকার মৈত্রী ও অহিংসার প্রতীক-রূপে গৃহীত হয়েছে।

সারনাথের অশোকস্তম্ভের সিংহচূড়া

অশোকের মহত্ত্ব ঃ—বোধ হয় খ্রীঃ পূঃ ২৩২ অব্দে রাজর্ষি অশোক ইহলোক ত্যাগ করেন। অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেছে, তার কোন চিহ্নই নেই। কিন্তু অশোকের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। কারণ, এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও স্বেচ্ছায় এমনভাবে আর কোন সম্রাট্ শান্তি ও মৈত্রীর পথ গ্রহণ করতে পারেন নি।

অনুশীলনী

১। অশোককে আদর্শ রাজা বলা হয় কেন? কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব?

২। এ গুলি সম্বন্ধে কি জান বল—'ধর্মবিজয়', 'ধর্মলিপি', 'বিহারযাত্রা,' ধর্মযাত্রা, ধর্মমহামাত্র, সারনাথের সিংহচূড়া।

৩। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও মানবহিতের জন্য অশোক কি করেছিলেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রোমের অভ্যুত্থান ও মহাবীর হানিবল

মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, গ্রীশের ঠিক পশ্চিমে একটা দেশ আছে, তার আকৃতি যেন একটা বুটপরা পায়ের মত। এর নাম ইতালি। বুটের ডগাটা একটা দ্বীপের গায়ে প্রায় লেগে আছে, তাকে বলে সিসিলি। প্রাচীনকালে এখানে ছিল কতকগুলি গ্রীক্ উপনিবেশ ; এগুলিকে বলা হত 'বৃহত্তর গ্রীশ'।

লাতিন জাতি :—আর্যরা যখন গ্রীশ দখল করেছিল, তখন তাদের অন্য কতকগুলি দল উত্তর দিক দিয়ে এসে ইতালিতেও বসবাস আরম্ভ করেছিল। এদের কতকের ভাষা ছিল লাতিন। এই লাতিন-ভাষীরা টাইবার নদীর দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চল দখল করে বসেছিল।

রোমের উত্থান :—টাইবার নদীর এক স্থানে জল ছিল খুব কম, হেঁটে নদী পার হওয়া যেত। এখানে এপার আর ওপারের লোকেদের মধ্যে চলত ব্যবসা-বাণিজ্য। ক্রমে এ স্থানটা একটা গঞ্জ হয়ে উঠল এবং এখানকার সাতটা নীচু পাহাড়ের উপর অনেক লোক বসবাস আরম্ভ করল। এই বাসস্থানগুলি মিলে ক্রমে গড়ে উঠল একটি নগর। এরই নাম রোম।

প্রবাদ আছে খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ সালে রোমুলাস ও রেমুস নামে দু'ভাই রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোমুলাসের নামানুসারেই এ নূতন নগরীর নাম হয় রোম। এ কথা কিন্তু কেউ সত্য বলে মনে করে না। তবে একথা ঠিক যে, প্রথমে রোমে চ'লেছিল রাজার

শাসন। এঁরা যখন অত্যাচারী হয়ে উঠলেন তখন রোমানরা রাজপদ তুলে দিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল (খ্রীঃ পূঃ ৫১০)। এখন থেকে জনসাধারণই দু'জন শাসনকর্তা নির্বাচন করতে লাগল ; তাদের বলা হ'ত **কন্সাল**। প্রতি বৎসর নূতন কন্সাল নির্বাচন হত। কিন্তু আসল ক্ষমতা ছিল সেনেট নামে একটি পরিষদের হাতে। ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে সেনেটের সদস্য মনোনয়ন ক'রতেন কন্সালরা। এই সম্ভ্রান্ত জমিদারবংশের লোকদের বলা হ'ত **'পেট্রিসিয়ান,** 'আর সাধারণ নাগরিকদের বলা হ'ত **'প্লেবিয়ান।** প্লেবিয়ানরা ছিল দরিদ্র নিঃসহায়ের দল। তাদের না ছিল অর্থ না ছিল কোন অধিকার। সমস্ত ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ছিল পেটিসিয়ানদের হাতে। এই অবস্থায় প্লেবিয়ানরা যে অসন্তুষ্ট হবে তাতে আর বিচিত্র কি ? ক্ষমতালাভের জন্য তারা আরম্ভ ক'রল সংগ্রাম। দু'শ বছর পর্যন্ত ঝগড়া-ঝাটি করে, রোম ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে, ক্রমে তারা ক্ষমতা ও অনেক সুবিধা আদায় করে নিল। এভাবে আসল প্রজাতন্ত্র।

রোমের বিস্তার :—এই ঘরোয়া বিবাদের মধ্যে বাইরের শত্রুর সঙ্গেও রোমকে ক্রমাগত লড়তে হচ্ছিল। গোড়ার দিকে গ্রীক্ রাষ্ট্রগুলির মত রোমও ছিল একটি নগর-রাষ্ট্র। কিন্তু প্রতিবেশী জাতিগুলির সঙ্গে যুদ্ধের ফলে রোম ক্রমে বেড়েই চলল। দু'শ বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে, আলেকজাণ্ডার যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছিলেন, তখন সমগ্র মধ্য ইতালি জুড়ে রোমান অধিকার বিস্তৃত হ'ল। ইতালির দক্ষিণ প্রান্তের গ্রীক্ নগরগুলিও শেষ পর্যন্ত রোমের অধিকারে এসে গেল (খ্রীঃ পূঃ ২৭৫)।

রোম-কার্থেজ সংঘর্ষ :—রোম যখন ইতালিতে দিন দিন বড় হ'য়ে উঠছিল, তখন ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে উত্তর আফ্রিকায় ফিনিশীয় উপনিবেশ কার্থেজও প্রবল হ'য়ে উঠছিল। এই সময়ে

কার্থেজই ছিল শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র; তার নৌ-শক্তিও ছিল অদ্বিতীয়। ভূমধ্যসাগরের সার্ডিনিয়া, কর্সিকা প্রভৃতি কতকগুলি দ্বীপও তারা দখল ক'রে নিয়েছিল। রোমানরা যখন গ্রীকদের তাড়িয়ে দক্ষিণ ইতালি অধিকার করে, তখন গোটা সিসিলি দ্বীপটা নিয়ে নিল কার্থেজীয়ানরা। এভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

কিন্তু এত কাছাকাছি দুটো শক্তিশালী রাজ্য থাকতে পারে না। রোম যেই সিসিলির দিকে হাত বাড়াল, অমনি দু'পক্ষে বেধে গেল জলে-স্থলে প্রচণ্ড সংগ্রাম। কার্থেজের সঙ্গে রোমের এই যুদ্ধকে বলে "পিউনিক যুদ্ধ"। শ'খানেক বছরের মধ্যে পর পর তিনটা পিউনিক যুদ্ধ ঘটেছিল।
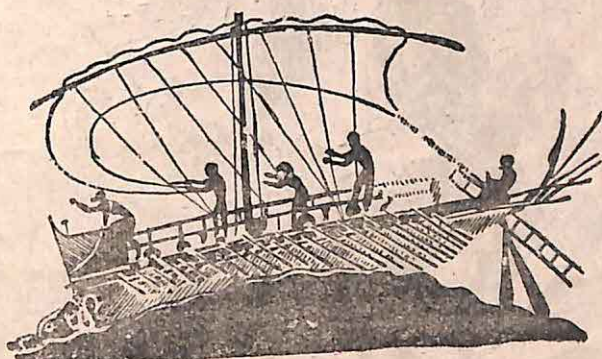
রোমের যুদ্ধ জাহাজ

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ:—প্রথম পিউনিক যুদ্ধ চ'লেছিল ২৩ বছর—খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ থেকে ২৪১ পর্যন্ত। কার্থেজের নৌ-বল ছিল রোমের চেয়ে অনেক বেশী। তার বড় বড় সব যুদ্ধ-জাহাজ। এগুলির দু'দিকেই পাঁচ সারি করে দাঁড়। সুতরাং রোমানরা প্রথমটা খুবই বিপন্ন হ'য়ে প'ড়ল। কিন্তু তাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি

ছিল প্রখর। অল্পদিনের মধ্যেই তারা গ্রীক্ কারিগর দিয়ে অনেক বড় বড় জাহাজ তৈরি ক'রে ফেলল; আর যুদ্ধেরও নূতন কৌশল বের ক'রে ফেলল। ফলে যুদ্ধের গতি একেবারে ফিরে গেল। কার্থেজ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হ'ল এবং সিসিলি দ্বীপও প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্ধি ক'রতে বাধ্য হ'ল।

মহাবীর হানিবল ও দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধঃ—বছর কুড়ি পর খ্রীঃ পূঃ ২১৮ সালে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পিউনিক্ যুদ্ধ। এ যুগে কার্থেজের সেনানায়ক ছিলেন মহাবীর হানিবল। আলেকজাণ্ডারের মত তিনিও ছিলেন পৃথিবীর একজন বড় যোদ্ধা। রোমকে আর কখনো এমন প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয় নি।

হানিবল সসৈন্যে রোম আক্রমণ করতে যাচ্ছেন

হানিবলের পিতা হালিমকর ছিলেন কার্থেজের একজন প্রধান সেনাপতি। প্রথম যুদ্ধে সিসিলি হস্তচ্যুত হওয়ায় তিনি কার্থেজের জন্য স্পেন জয় ক'রতে যান। স্পেন অধিকার ক'রে রোমের শক্তির

উচ্ছেদ করাই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। হানিবলের বয়স তখন ন'বছর। পিতা তাঁকে দেবতা সাক্ষী রেখে এই কঠোর শপথ করালেন যে, আজীবন তিনি রোমকে শত্রু বলে মনে ক'রবেন,—রোমের ধ্বংস-সাধনই হবে তাঁর জীবনের ব্রত। হানিবল জীবনে কখনো এ প্রতিজ্ঞা ভোলেন নি। পিতার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তিনি হ'য়ে উঠলেন অসাধারণ যোদ্ধা। পিতার মৃত্যুর পর হানিবল স্পেনের কার্থেজীয় বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রলেন এবং এব্রো নদী পর্যন্ত স্পেন অধিকার ক'রে ফেললেন। তারপর তিনি যখন রোমের আশ্রিত একটি গ্রীক্ উপনিবেশ দখল ক'রলেন তখন রোমের সঙ্গে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।
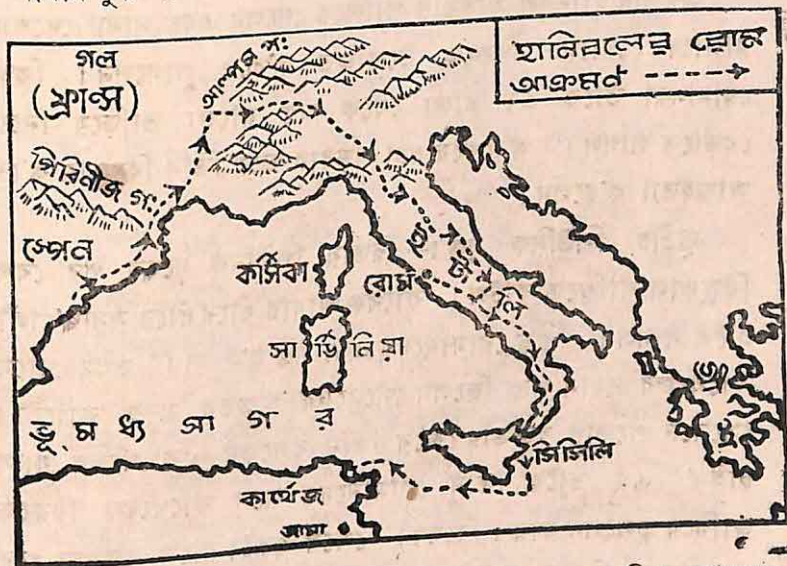
প্রকাণ্ড এক সেনাদল নিয়ে হানিবল স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে আল্পস্ পর্বত ডিঙিয়ে ইতালিতে এসে উপস্থিত হ'লেন। পনের বছর ধ'রে যুদ্ধ চ'লল। যুদ্ধের পর রোমানদের ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়ে তিনি তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার ক'রলেন।

রোমানরা কিন্তু কিছুতেই দমল না। শেষে তারা সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে পিছনে লেগে থেকে হানিবলকে হয়রাণ ক'রে তুলল এবং কার্থেজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল। তারপর রোমান সেনাপতি সিপিও যখন সাগর পার হ'য়ে গিয়ে কার্থেজ আক্রমণ করলেন তখন হানিবলকে ইতালি ছেড়ে চলে যেতে হ'ল দেশ রক্ষা করতে। খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে ইতিহাস-বিখ্যাত **জামার যুদ্ধে** হানিবল সিপিওর নিকট পরাস্ত হ'লেন। তখন কার্থেজ তার নৌ-বহর ও স্পেন রোমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি ক'রতে বাধ্য হ'লেন আর ক্ষতিপূরণও দিলেন প্রচুর।

এর পর হানিবল এশিয়ায় পালিয়ে গেলেন এবং নানা দেশের রাজাদের রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রতে লাগলেন। কিন্তু রোমানরা তাঁকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। অবশেষে ধরা পড়বার ভয়ে তিনি বিষপান ক'রে আত্মহত্যা ক'রলেন।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধঃ—দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর বেশ কিছুকাল শান্তিতে কাটল। কার্থেজ আবার ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী হ'তে লাগল। কিন্তু রোমানদের এটা সহ্য হ'ল না। তখন রোমে কার্থেজের প্রধান শত্রু ছিলেন সেনেটের অন্যতম সদস্য ক্যাটো। সেনেটে প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে তিনি বলতেন—'কার্থেজের ধ্বংস চাই।' এই ভাবে তিনি রোমানদের মনে কার্থেজের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুললেন দারুণ বিদ্বেষ। শেষে একটা বাজে অজুহাত ধরে রোমানরা আবার কার্থেজ আক্রমণ ক'রল। এবার তারা কার্থেজ নগরী অধিকার ক'রে আগুনে পুড়িয়ে দিল এবং গোটা শহরটা লাঙ্গল দিয়ে চ'ষে দিল। হতাবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার নর-নারী হ'ল ক্রীতদাস। এইরূপে প্রাচীন যুগের একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীর হল চির অবসান (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬)।

এর পর অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে রোমের আধিপত্য স্থাপিত হ'ল।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন রোমের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হয়?

২। পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে প্রভেদ কি? তাদের কি জন্য ঝগড়া হয়েছিল এবং তার ফল কি হয়েছিল?

৩। কার্থেজের সঙ্গে রোমের বিবাদের কারণ কি? হানিবলের সঙ্গে রোমের যুদ্ধের কাহিনী বল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যের যুগে রোমের জীবনযাত্রা ও ভারতের সহিত বাণিজ্য

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় থেকে শুরু ক'রে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া—এই তিন মহাদেশের বৃহৎ অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল বিরাট রোম সাম্রাজ্য। ইতালী ছাড়া গ্রীশ, স্পেন, ফ্রান্স ইংলণ্ড, কার্থেজ, মিশর, এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়া—এই এতগুলি দেশ হ'য়ে পড়ল রোমের শাসনাধীন।

ডিক্টেটরদের উত্থান :—কিন্তু রোম যখন সাম্রাজ্যের অধিকারী হ'ল, তখন নানা জটিল সমস্যা দেখা দিল। সেনেট এ সকল সমস্যার সমাধান ক'রে উঠতে পারল না। পুরানো শাসন-ব্যবস্থা অচল হ'য়ে প'ড়ল। এই অবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা সেনেটের হাত থেকে চ'লে গেল শক্তিশালী সমর-নায়কদের হাতে। পর পর কয়েকজন সমরনায়কের আবির্ভাব হ'ল। তাঁদের বলা হয় 'ডিক্টেটর' বা একনায়ক। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ইচ্ছামত শাসনকার্য চালাতে থাকেন।

রোম সাম্রাজ্য
জর্ম্মানী
গ ল
স্পেন
ই তা লি
দানিয়ুব নদ
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়া
আর্মেনিয়া
আসিরিয়া
মেসোপোটেমিয়া
সিরিয়া
প্যালেষ্টাইন
আ র ব
মি শ র
আ ফ্রি কা
কার্থেজ
নিউমিডিয়া
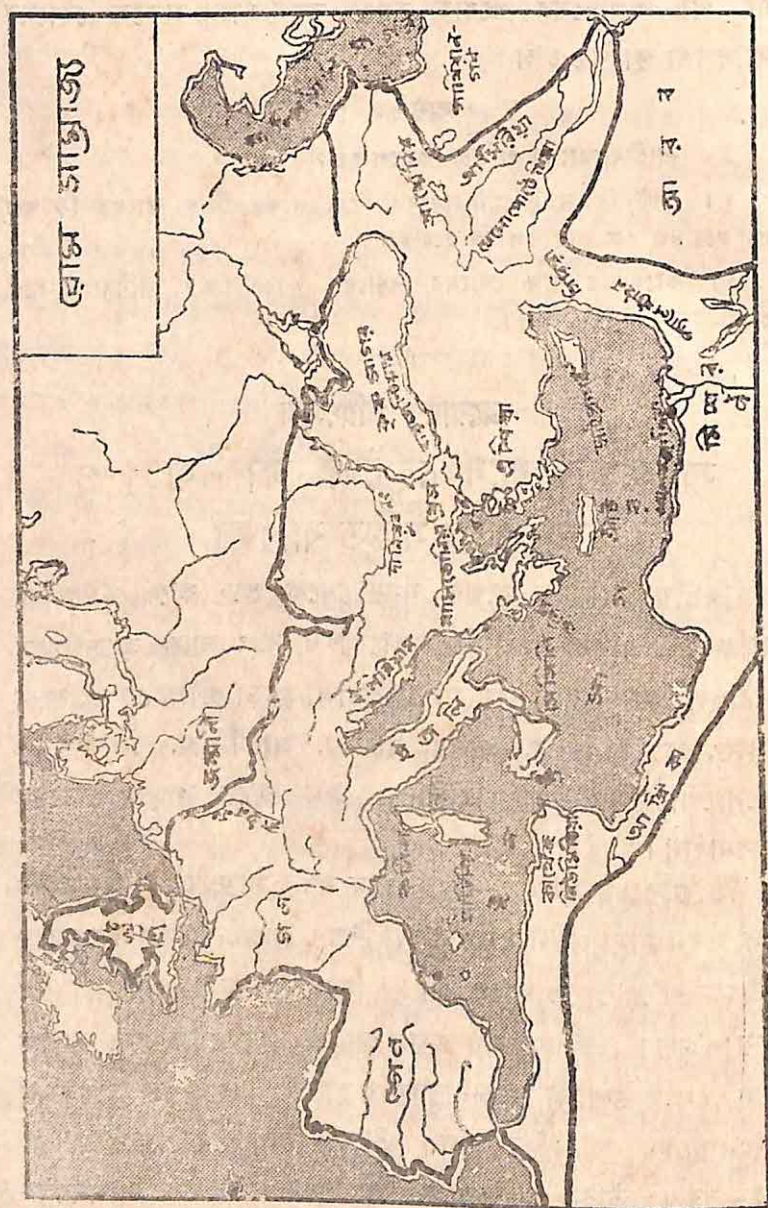
জুলিয়াস্ সীজারঃ—এঁদের মধ্যে শেষ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন জুলিয়াস্ সীজার। তিনি খ্রী পূঃ ৫৮ সালে গল্ বা ফ্রান্সের শাসন-

জুলিয়াস সিজার

ভার পান। আট বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানীর কিছু অংশ জয় ক'রে অশেষ খ্যাতি ও ক্ষমতার অধিকারী হ'লেন। এদিকে রোমে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেষ্টা ক'রতে লাগল। তখন সীজার তাঁর বিজয়ী সেনাদল নিয়ে ফিরে এলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠলেন। তিনি চির-জীবনের জন্য ডিক্টেটর বা একনায়ক নিযুক্ত হ'লেন। কিন্তু তাঁর

এত ক্ষমতা অনেকের মনে ভয় ও ঈর্ষার উদ্রেক ক'রল। অবশেষে একদিন সেনেটে প্রবেশকালে তাঁর কয়েকজন শত্রু তাঁকে হত্যা ক'রল (খ্রীঃ পূঃ ৪৪)।

সম্রাট্ অগাষ্টাস্

রোমান সম্রাট্‌গণ :—সীজারের মৃত্যুর পর তাঁর পালিত পুত্র অক্টেভিয়াস্ প্রতিপক্ষকে পরাস্ত ক'রে ক্ষমতা হস্তগত ক'রলেন এবং মিশর জয় ক'রলেন। সেনেট তাঁকে 'অগাস্টাস্' (মহিমান্বিত) ও 'ইম্পারেটার' ব'লে অভিনন্দিত ক'রল। এই 'ইম্পারেটার' থেকেই পরে ইংরেজী 'এম্পারার' (সম্রাট) কথাটি এসেছে। অক্টেভিয়াস অগাস্টাস সীজার নাম নিয়ে প্রথম সম্রাট হ'লেন (খ্রীঃ পূঃ ২৭)।

অগাস্টাসের রাজত্বকে বলা হয় রোমের ইতিহাসে স্বর্ণ-যুগ। এ সময়ে নানা দিকে রোমের শ্রীবৃদ্ধি হ'য়েছিল।

কত বিভিন্ন চরিত্রের সম্রাটই না রোমে রাজত্ব ক'রে গেছেন। অগাস্টাস ছিলেন বিজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী। অগাস্টাসের কিছু পর সম্রাট হন নিরো (৫৪ খ্রীঃ)। তাঁর মত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী সম্রাট্ আর কেউ ছিলেন না। একবার রোম নগরী যখন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল তখন নিরো নাকি মহানন্দে ব'সে বীণা বাজাচ্ছিলেন।

মার্কাস অরেলিয়াসের শোভাযাত্রা

কিন্তু সম্রাট **মার্কাস অরেলিয়াস** (খ্রীঃ ১৬১—১৯০) ছিলেন অতি চরিত্রবান ও দার্শনিক। তাঁর 'মেডিটেশনস্' (চিন্তালহরী) নামক পুস্তকে তিনি নিজের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। মার্কাস অরেলিয়াসের রাজত্বের পরই রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

রোমের ঐশ্বর্য ও জীবনযাত্রা :—সে যুগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন

অংশ থেকে রোমে আমদানি হ'ত অজস্র ধন-রত্ন, খাদ্য-দ্রব্য, আর আড়ম্বর ও বিলাসের নানাবিধ উপকরণ। রোমের খাদ্য যোগাত প্রধানতঃ মিশর আর সিসিলি। সাম্রাজ্যের সর্বত্র গ'ড়ে উঠেছিল মন্দির, থিয়েটার, স্নানাগার ও রঙ্গালয়-শোভিত বড় বড় নগর। আর এদের মধ্যমণি ছিল সুন্দরী রোম নগরী। শ্বেত পাথরে তৈরী বহু মন্দির, বড় বড় স্নানাগার, নানাপ্রকার খেলাধূলা ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য সার্কাস ও রঙ্গভূমি, চমৎকার সব ফোরাম বা বাজার, বিজয়-তোরণ, স্তম্ভ প্রভৃতি রাজধানীর শোভা বর্ধন ক'রত।

রঙ্গালয়ে হিংস্র পশুর সঙ্গে গ্লাডিয়েটরদের লড়াই

'কলোসিয়াম' নামক বিখ্যাত রঙ্গ-ভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শকের বসার স্থান ছিল। রোমানদের রুচি গ্রীকদের রত মার্জিত ছিল না। তারা সার্কাসে ও কলোসিয়ামে গিয়ে ষাঁড়, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর লড়াই, রথের দৌড়, গ্লাডিয়েটর নামক পেশাদার যোদ্ধাদের পরস্পরের সঙ্গে বা হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই—এ সব নিষ্ঠুর ক্রীড়াকৌতুক দেখাই বেশী পছন্দ ক'রত।

সমাজে ক্রীতদাসদের গুরুত্বঃ—এ সময়ে রোমের অধিবাসীদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, সৈনিক ওক্রীতদাসরাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন কৃষকেরা এক সময়ে রোম প্রজাতন্ত্রের মেরুদণ্ড ছিল। কিন্তু দেশজয়ের ফলে ধনীরা বড় বড় ক্ষেত-খামারের মালিক হ'য়ে ক্রীত-দাসদের দিয়েই সস্তায় চাষ-বাস করতে লাগল। দেশের লোক-সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ছিল ক্রীতদাস। শ্রমসাধ্য সব কাজ এদের দ্বারাই করান হ'ত। অনেক শিক্ষিত ক্রীতদাসও ছিল ; তারা শিক্ষক চিকিৎসক প্রভৃতির কাজ ক'রত। এভাবে গোটা সমাজটাই চ'লত দাস-শ্রমের উপর নির্ভর ক'রে। এর ফলে রোমানরা হ'য়ে পড়েছিল অলস ও বিলাসী। এভাবেই বপন করা হ'য়েছিল পতনের বীজ।

রোমান সভ্যতার দান ঃ—রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি মোটামুটি দু'শ বছর পর্যন্ত শান্তি ভোগ ক'রেছিল। এর ফলে মিশর, বাবিলন ও গ্রীশের মত রোমেও উচ্চ সভ্যতার বিকাশ হ'য়েছিল। রোম-অধিকৃত দেশগুলি বড় বড় রাস্তা, হাসপাতাল, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কাজে ভ'রে গিয়েছিল। এখনও এগুলির ধ্বংসাবশেষ দেশে দেশে দেখা যায়। রোমের একটা বড় দান হ'ল তার আইন। ইউরোপের সকল দেশের আইনের ভিত্তি হ'ল এই রোমের আইন। এ সময়ে লাতিন সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছিল। যদিও তার মূল প্রেরণা জুগিয়েছিল গ্রীক সাহিত্য। শ্রেষ্ঠ রোমান কবি ছিলেন ভার্জিল। তিনি ছিলেন রোমের হোমর। তাঁর রচিত ইনিড কাব্য বিখ্যাত। এতে তিনি ট্রয় নগরের পতনের পর থেকে 'ইনিয়াস্ এর বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা ক'রেছেন। এই গল্পে কল্পনা করা হ'য়েছে যে ইনিয়াস ছিলেন ট্রয়ের একজন বিখ্যাত বীর এবং জুলিয়াস্ সীজার ছিলেন তাঁরই বংশধর। লিভি ও টাসিটাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। রোমান ইতিহাসের জনক হ'লেন লিভি। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে রোম সাধারণতন্ত্রের গৌরবপূর্ণ কাহিনী লিখে গেছেন। আর টাসিটাস্ তাঁর ইতিহাসে রোমান চরিত্রের ত্রুটী দেখিয়ে দিয়ে তাদের পতনের কারণ নির্দেশ করেছেন।

ভারতের সহিত বাণিজ্য ঃ—অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে, পশ্চিমের দেশগুলির বাণিজ্য চ'লত। রোম যখন পশ্চিম এশিয়া ও মিশর জয় ক'রল তখন প্রচুর ভারতীয় পণ্য রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আমদানি হ'তে থাকে। ভারতীয় বাণিজ্যতরী লোহিত সাগরের মোহনা পর্যন্ত যাতায়াত ক'রত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য বেড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক স্ট্রাবো লিখে গিয়েছেন যে, অগাস্টাস রোমের সম্রাট্ হলে পর একজন ভারতীয় রাজা তাঁর নিকট দূত পাঠান ; আর সঙ্গে পাঠান কতকগুলি বিচিত্র উপহার, যেমন—বাঘ, কচ্ছপ, অজগর ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে নাকি একটি ছেলেও ছিল। তার হাত ছিল না একটাও। সে পায়ের আঙ্গুল দিয়েই নাকি এমন চমৎকার তীর ছুড়তে পারত যে তার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ।

সে সময় ভারত থেকে রোমে রপ্তানি হ'ত মস্‌লিন, সূতী কাপড় হাতীর দাঁত, মসলা ও রেশম ; আর এদেশে আমদানী হ'ত সামান্য পরিমাণ তামা, টিন, কাঁচ, আর গাইয়ে-বাজিয়ে সব ছেলে-মেয়ে। রোমে ভারতীয় বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা ছিল প্রচুর। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লেখক প্লিনি খেদ ক'রে ব'লে গেছেন যে, ভারতবর্ষ মসলা, গন্ধ-দ্রব্য, মসলিন ও মণি-মাণিক্য বিক্রী ক'রে রোম থেকে প্রতি বছর প্রায় ন' কোটি টাকার রোমান স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে আসত। বহু রোমান স্বর্ণ-মুদ্রা দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গিয়েছে।

অনুশীলনী

১। পিউনিক যুদ্ধের পর রোমে কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ?

২। 'ডিক্টেটর' কাকে বলে ? রোমের ডিক্টেটরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কে ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান বল।

৩। রোমের প্রথম সম্রাট কে ? তিনি কি ভাবে সম্রাটের পদলাভ করেন ?

৪। দেশ জয়ের ফলে রোমানদের চরিত্রে যে সকল দোষ দেখা দিয়েছিল তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৫। সেকালে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান ?

কাল-রেখা

সাল	যুগ	বৎসর	ঘটনা
খৃঃ পূঃ ৮০০	রোম রাজতন্ত্র		
		৭৫৩	রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা
" " ৭০০			
" " ৬০০			
		৫১০	রোম রাজতন্ত্রের অবসান
" " ৫০০	রোমান প্রজাতন্ত্রের যুগ		
" " ৪০০			
		৩৯০	গলগণ কর্তৃক রোম লুণ্ঠন
" " ৩০০			
		২৬৪	১ম পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ
		২১৮	২য় " " "
" " ২০০			
		১৪৬	কার্থেজ ধ্বংস
" " ১০০			
		৪৮	জুলিয়াস্ সীজার ডিক্টেটর হন
		২৭	অগাস্টাস সম্রাট হন
খৃষ্টাব্দ ০	রোমান সাম্রাজ্য		
		৫৪	নিরো সম্রাট হন
" ১০০			
		১৬১	মার্কাস অরেলিয়াস সম্রাট হন
		১৮০	মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যু
" ২০০			

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভারতে বৈদেশিক শাসন ঃ বিদেশে ভারতীয় ধর্ম

মহারাজ অশোকের বংশধরদের মধ্যে কেউ তেমন যোগ্য ছিলেন না। তাই অল্প দিনের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। এই সুযোগে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে গ্রীক্, পহ্লব, শক প্রভৃতি বিদেশী জাতি পর পর এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।

গ্রীক্ বা যবন অধিকার ঃ—অশোকের জীবিতকালেই, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে, হিন্দুকুশের ওপারে ব্যাক্ট্রিয়া বা বহ্লীক প্রদেশের গ্রীক্রা পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হ'লে পর এই ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক্রা বার বার ভারত আক্রমণ করে এবং গান্ধার (আফগানিস্থান ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ), শাকল (উত্তর ও মধ্য পাঞ্জাব) ও সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করে। এমন কি এরা এক সময়ে পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এই গ্রীক্ রাজারা সুন্দর সুন্দর মুদ্রার প্রচলন ক'রেছিলেন। এ সকল মুদ্রায় তাঁদের প্রতিকৃতি ও নাম অঙ্কিত থাকত। প্রধানত এ সব মুদ্রা থেকেই ভারতের গ্রীক রাজাদের কথা আমরা জানতে পেরেছি।

ভারতের গ্রীক রাজাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'লেন পঞ্জাবের রাজা মিনান্দার। ভারতীয়রা তাঁকে ব'লতেন মিলিন্দ। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ১৬০ থেকে ১৪০ মধ্যে তিনি সগৌরবে রাজত্ব ক'রেছিলেন। শাকল বা শিয়ালকোট ছিল তাঁর রাজধানী। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর খ্যাতি রাজ্যজয়ের জন্য নহে; বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন ব'লেই তাঁর নাম। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'(মিলিন্দের প্রশ্ন) নামক পালি গ্রন্থে তাঁকেই মিলিন্দ ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে; এই গ্রন্থে মিলিন্দ ও বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে

বৌদ্ধ-ধর্মের আলোচনা আছে। মিলিন্দ নাকি তর্কে হেরে গিয়ে নাগসেনের নিকট বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হন।

ভারতে গ্রীক্ শাসন এক শ' বছরের কিছু বেশী স্থায়ী হ'য়েছিল। শেষের দিকে অনেক ছোট ছোট গ্রীক্ রাজা দেখা দিয়েছিলেন। এঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদের ফলে দুর্বল হ'য়ে পড়েন। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে এক যাযাবর জাতির আক্রমণে গ্রীক্ শাসন লুপ্ত হয়। এদের বলা হয় শক।

শকাধিকার :—শক জাতি বাস ক'রত মধ্য এশিয়ায়। ইউ-চি নামে আর একটি যাযাবর জাতির বাস ছিল তার পূর্বদিকে চীন সীমান্তে। খ্রীঃ পূঃ ১৬৫ অব্দের কাছাকাছি এক সময়ে হিউং-নু (সম্ভবতঃ হুণ) নামে আর একটি যাযাবর জাতি সেখান থেকে ইউ-চি-দের বিতাড়িত ক'রল। তখন ইউ-চি-রা স'রে এসে শকদের উপর চাপ দিতে লাগল। শক্‌রা দক্ষিণ দিকে চলে এসে ভারতবর্ষে উপস্থিত হ'ল এবং তক্ষশীলা, মথুরা, মালব এবং সুরাষ্ট্রে রাজ্য স্থাপন ক'রল। এই শক্ রাজারা ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারণ ক'রতেন। সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শক্ রাজা ছিলেন মালবের মহাক্ষত্রপ **রুদ্রদামন** (আনুঃ খ্রীঃ ১৩০-১৫০)। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পহ্লবগণ :—কিছু দিনের মধ্যেই পার্থিয়ার (পারস্যের) **পহ্লবগণ** শক্‌দিগকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে নিজেদের রাজ্য স্থাপন ক'রল। শকেরা তখন ভারতের অভ্যন্তরে ছিল বটে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল পহ্লবদের নিকট ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। পহ্লবরাজগণের মধ্যে গুদফর বা গন্দোফার্ণেসের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি তক্ষশীলায় রাজত্ব ক'রতেন। প্রবাদ আছে, তাঁর রাজত্বকালে যীশুখ্রীস্টের অন্যতম শিষ্য **সেন্ট টমাস্** এদেশে ধর্ম প্রচার ক'রতে এসেছিলেন।

কুষাণ-বংশ :—সকলের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রল **কুষাণ** জাতি। ইউ-চি জাতি শক্‌দের তাড়িয়ে দিয়ে অক্ষু বা আমুদরিয়া নদীর উপত্যকায় বাস ক'রতে থাকে। কুষাণরা ছিল ইউ-চি-দের একটা শাখা। একজন কুষাণ নেতা ইউ-চি-দের সংঘবদ্ধ করেন এবং হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে পহ্লবদের পরাস্ত করেন। ক্রমে কুষাণগণ অগ্রসর হ'য়ে উত্তরভারতে রাজ্য বিস্তার ক'রল।

কণিষ্ক :—কুষাণ রাজাদের মধ্যে **কণিষ্কই** ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজত্ব কালেই কুষাণ সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়। কণিষ্ক ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি কাশ্মীর জয় করেন এবং পরে পূর্ব-তুর্কীস্থানে কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, চীন সম্রাটকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে তিনি একজন চীনা রাজকুমারকে সন্ধির জামিন স্বরূপ নিজরাজ্যে আটক ক'রে রাখেন। এইরূপে তিনি মধ্য-এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়েছিলেন।

কণিষ্কের ভাঙ্গা মূর্তি

কণিষ্কের রাজধানী ছিল **পুরুষপুর** (পেশোয়ার)। তিনি বহু বৌদ্ধ-স্তূপ, বিহার ও মন্দিরাদি নির্মাণ ক'রে রাজধানী পুরুষপুরকে সাজিয়েছিলেন। তার অদূরে তক্ষশীলাও (রাওয়ালপিণ্ডির নিকটস্থ প্রাচীন সহর) তখন বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের বংশধরদের সময়ে মথুরা কুষাণ-শক্তির কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। তাঁরা মথুরাকেও শিল্প-সৌন্দর্যে শোভিত ক'রেছিলেন। এখানে তুর্কী

পোষাক-পরা কণিষ্কের একটি চমৎকার ভগ্ন প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

কণিষ্ক বড় যোদ্ধা ছিলেন ; তিনি অনেক রাজ্য জয় করেন। কিন্তু যুদ্ধ জয়ই তাঁর বড় কীর্তি নয়। প্রিয়দর্শী অশোকের মত তিনিও বৌদ্ধধর্মের প্রচারে সহায়তা ক'রেছিলেন। এইজন্য ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। কণিষ্ক তেইশ বছর রাজত্ব করেন, কিন্তু তিনি যে কবে সিংহাসনে আরোহণ করেন তা' আজও সঠিক জানা যায় নি। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি ৭৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। ঐ সাল হইতে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। কণিষ্কের পর সম্রাট হন বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, ২য় কণিষ্ক ও বাসুদেব। তারপর কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। কুষাণগণ তিন শ' বছর রাজত্ব ক'রেছিল।

বৈদেশিকদের ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ :—এই যুগে ভারতে যে সকল বিদেশী জাতি এসেছিল তারা ক্রমে খাঁটি ভারতীয় হ'য়ে গিয়েছিল। বৈদেশিক রাজাদের অনেকেই ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন। কেউ হ'য়েছিলেন শৈব, কেউ বা বৈষ্ণব, কেউ বা বৌদ্ধ। কণিষ্ক তো সে যুগের বৌদ্ধ-ধর্মের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক বিদেশী রাজা ভারতীয় নাম গ্রহণ ক'রেছিলেন। কণিষ্কের বংশধর বাসুদেবের নাম থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁরা নিজেরা শুধু ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ ক'রে ক্ষান্ত হন নি, সেকালের ভারতীয় জ্ঞানী ও গুণী লোকদের নিজেদের রাজ-সভায় সসম্মানে স্থান দিয়েছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, বুদ্ধ-চরিতের লেখক মহাপণ্ডিত অশ্বঘোষ আর আয়ুর্বেদ গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক চরকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়ুর্বেদ গ্রন্থের আর একজন বিখ্যাত লেখক সুশ্রুতও এ যুগেরই লোক।

বৈদেশিক প্রভাব :—এই যুগে ভারতে বৈদেশিক সংস্কৃতির

প্রভাব দেখা দিয়েছিল। ভারতের বৈদেশিক রাজারা গ্রীক্, রোমান ও পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার অনেক কিছু ভারতে প্রবর্তন করেন। তার ফলে ভারতের ধর্ম ও শিল্পে নূতন ভাবধারার বিকাশ হয়। গ্রীক্ ও রোমান রীতির সহিত ভারতীয় শিল্প-রীতির মিলনে এক অপূর্ব শিল্প-রীতির সৃষ্টি হয়। তাকে বলা হয় **গান্ধার শিল্প।** গ্রীক দেবতাদের মূর্তির অনুকরণে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ আরম্ভ হয় এ সময়েই। কুষাণ রাজারা রোমান মুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন করেন। এগুলির এক দিকে থাকত রাজার প্রতিকৃতি আর অন্য দিকে ভারতীয় ও বিদেশী নানা দেবতার মূর্তি।

বৌদ্ধ-ধর্মের রূপান্তর ও প্রসার :—গৌতম বুদ্ধ ও অশোকের সময়ে বৌদ্ধ-ধর্মের যে রূপ ছিল, কুষাণ যুগে বৌদ্ধ ধর্মের আর সে রূপ ছিল না। অশোকের চেষ্টায় বুদ্ধের ধর্ম যখন বাইরে ছড়িয়ে প'ড়ছিল তখন তাকে বিভিন্ন মতের সংস্পর্শে আসতে হয়ে'ছিল। আবার দেশের ভিতরেও হিন্দু ধর্ম তাকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রছিল। তার ফলে বুদ্ধের সরল ধর্মের মধ্যে এখন এক মস্ত বড় পরিবর্তন এসে গেল। আগের যুগে বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁর সত্য, সংযম ও অহিংসার বাণী মেনে চলতে চেষ্টা ক'রত। নির্বাণলাভই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য। কোন পূজা-পার্বণ বা মূর্তি-পূজার ধার তারা ধারত না। বুদ্ধ ছিলেন তাদের শিক্ষা-গুরু। কিন্তু এ যুগে বুদ্ধের মূর্তিপূজাই বৌদ্ধ-ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল। তিনি হলেন মানুষের ত্রাণ-কর্তা ভগবান। ভারতে আগত যে সমস্ত গ্রীক্ বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন, তাঁরাই প্রথম তাঁদের দেশের দেবতার মত ক'রে বুদ্ধের মূর্তি গড়তে আরম্ভ করেন। তারপর থেকেই মন্দিরে মন্দিরে বুদ্ধের উপাসনা চ'লতে আরম্ভ করে। সম্রাট কণিষ্ক এই মতই গ্রহণ করেন। একেই বলে **মহাযান** আর প্রাচীন মতকে বলে **হীনযান।**

এসময়ে কাশ্মীর, গান্ধার ও আশেপাশের অঞ্চলে মহাযান-মতই প্রচলিত ছিল। সম্রাট কণিষ্কের উদ্দীপনায় বৌদ্ধ-স্তূপ, মঠ ও মন্দিরে এই অঞ্চল ভ'রে গেল। এখান থেকেই আবার এই মহাযান-মত মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়ে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগল। প্রবাদ আছে যে, কশ্যপ-মাতঙ্গ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং চীন সম্রাট মিঙ-টি ৬৭ খ্রীস্টাব্দে বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করেন। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে কিন্তু হীনযান-মতই প্রচলিত।

অনুশীলনী

১। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন্ বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণ করে? ভারতে বৈদেশিক রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

২। বৈদেশিক রাজাদের মধ্যে মহারাজ কণিষ্কের নাম এত বিখ্যাত কেন? তিনি বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য কি কাজ করে গেছেন?

৩। এযুগে বৌদ্ধধর্মের কি পরিবর্তন হয়েছিল? মহাযান ও হীনযান বলতে কি বুঝ?
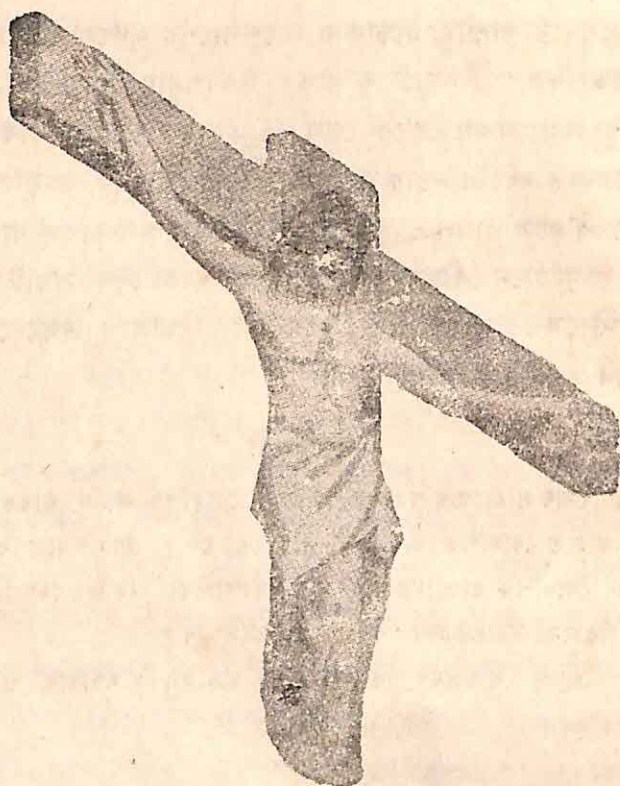
যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার

রোমানরা যে সকল দেশ অধিকার ক'রেছিল তার মধ্যে একটি হ'ল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে ইহুদীদের দেশ জুডিয়া বা প্যালেস্টাইন। বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ শ' বছর পর এই দেশেই আর একজন মহা-পুরুষের জন্ম হয়। বুদ্ধের মত তিনিও সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার করেন ঃ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে, মানুষকে ভালবাসতে বলেন। তিনিই যীশুখ্রীষ্ট। খ্রীষ্টানেরা মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। খ্রীষ্টের জন্ম থেকে খ্রীষ্টাব্দের গণনা করা হয়।

যীশুর জন্ম ঃ—অতি সাধারণ ঘরেই যীশুর জন্ম হয়। তাঁর মায়ের নাম মেরী, পিতার নাম যোসেফ। যোসেফ ছিলেন ছুতোর। গালিলি প্রদেশের নেজারেথ নামক ছোট একটি সহরে ছিল তাঁদের বাস। সেখান থেকে একবার কোন কাজ উপলক্ষে তাঁরা যান জেরুসালেমের নিকট বেথেলহেমে। সেখানে এক আস্তাবলে মেরীর একটি ছেলে হয়। এই ছেলের নাম যীশু।

প্রাচ্য দেশের জ্ঞানীদের কথা ঃ—যীশুর জন্মের পরেই নাকি একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। তখন জুডিয়ার পূর্বদিকে বহুদূরে একদেশে নাকি তিনজন খুব জ্ঞানী লোক ছিলেন। যীশুর জন্ম সময়ে আকাশে একটা উজ্জ্বল নুতন তারা দেখে তাঁরা মনে ক'রলেন তবে বুঝি এতকাল পরে ইহুদীদের 'রাজা' এলেন মর্তে। তাঁরা তখন অনেক মূল্যবান উপহার নিয়ে উটের পিঠে চড়ে চ'ললেন প্যালেস্টাইনের দিকে। সেই তারাটিই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লল। চলতে চলতে শেষে তারাটি বেথেলহেমে সেই আস্তাবলটির উপর এসে স্থির হ'য়ে রইল। তখন তাঁরা বুঝলেন কোথায় জন্মেছেন সেই শিশু। সেখানে গিয়ে মাটিতে জানু পেতে উপহার দিলেন। মাতা মেরী বুঝলেন, যীশু শুধু তাঁর একার ন'ন, তিনি সকলের।

জনের প্রচার ঃ—যীশুর ছোটবেলার কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বাল্যকাল থেকেই তিনি ভাবতেন ভগবানের কথা। তখন জন নামে তাঁর এক জ্ঞাতি ভাই জর্ডন নদীর ধারে ধর্ম প্রচার ক'রতেন। তাঁর কাছে যতো লোক আসত, তিনি তাদের মন থেকে অসৎ ভাব দূর ক'রে পবিত্র হওয়ার জন্য জর্ডন নদীর জলে স্নান ক'রতে ব'লতেন। এই স্নানকে বলা হ'ত 'ব্যাপটিজম্' (অভিষেক), আর জনকে বলা হ'ত **জন্ দি ব্যাপটিস্ট** অর্থাৎ অভিষেককারী বা দীক্ষাগুরু জন।

যীশুর অভিষেক ও প্রচার ঃ—অন্যান্য লোকের সঙ্গে যীশুও জনের উপদেশ শুনতে যান এবং জন তাকে জর্ডনের জল দ্বারা অভিষিক্ত করেন। কিন্তু জুডিয়ার শাসনকর্তা হেরড জনকে ভাল চোখে দেখতেন না। শীঘ্রই জন কারাগারে আবদ্ধ হন এবং কিছুদিন পরে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তখন যীশু গালিলিতে চ'লে গেলেন এবং জনের মত প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার আরম্ভ ক'রলেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর। যীশুর শিক্ষা ও জীবনকথা আমরা জানতে পারি বাইবেলের **নিউ টেস্টামেণ্ট** অংশ থেকে।

যীশুর সুমধুর কথা শুনবার জন্য দলেদলে লোক আসতে লাগল। বুদ্ধের মত তিনিও ছিলেন করুণার অবতার। যত গরীব-দুঃখী, পাপী-তাপী, অন্ধ-আতুর—এদের মধ্যেই তিনি প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার ক'রতে লাগলেন আর তাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। বার জন প্রিয় শিষ্য সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তাঁরাও ছিলেন জেলে, মাঝি, ছুতোর প্রভৃতি সাধারণ ঘরের লোক। নানা স্থানে প্রচার কালে তিনি নাকি অনেক অলৌকিক শক্তিরও পরিচয় দিয়েছিলেন। কত অন্ধ-আতুর তাঁর স্পর্শ পেয়ে সুস্থ হয়েছে, এমন কি মৃত ব্যক্তিও প্রাণ পেয়েছে। এতে শিষ্যেরা বিস্ময় প্রকাশ ক'রলে তিনি ব'লতেন, বিশ্বাসের জোরে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

যীশুর শিক্ষা ঃ—ইহুদীরা মনে করত যে তারাই ঈশ্বরের প্রিয়, অন্য জাতিকে তারা নিজেদের সমকক্ষ মনে ক'রত না। কিন্তু যীশু ব'ললেন,—'ঈশ্বর প্রেমময়, তিনি সকলের পিতা। কাজেই ইহুদী হোক্ বা না হোক্, সকল মানুষই একে অন্যের ভাই। মানুষ পরস্পরকে ভাই এর মত ভালবাসবে, এই হল ভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ ক'রতে হ'লে চাই অন্তরভরা ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, মৈত্রী ও পবিত্রতা।' বললেন,—'অন্যের কাছ থেকে তোমরা সর্ব বিষয়ে যে রকম ব্যবহার পেতে চাও, তোমরাও তাদের

প্রতি সে রকম ব্যবহার ক'রবে।' শুধু এই নয়। আরো ব'ললেন, —'তোমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছ—তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা ক'রবে ; কিন্তু আমি ব'লছি—তোমরা শত্রুকেও ভালবাসবে ; যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের উপকার ক'রবে।' ব'ললেন,—'স্বার্থপর ধনীরা কখনো স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ ক'রতে পারবে না, পারবে কেবল তারাই—যারা গরীব কিন্তু সরল ও সৎ।'

যীশুর এসব কথা শুনে সাধারণ লোকেরা সকলেই তাঁর ভক্ত হ'য়ে উঠল ; কিন্তু গোঁড়া ইহুদী ও সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের এসব ভাল লাগবার কথা নয়। এসব মত প্রচারে তারা ভয় পেয়ে গেল। বিশেষ ক'রে যীশুর শিষ্যেরা যখন ব'লতে লাগলেন যে তিনিই হ'লেন মেশাইয়া খ্রীস্ট, অর্থাৎ ত্রাণ-কর্তা, তখন তারা বিষম চটে গেল। একটা ছুতোরের ছেলে, সে হ'ল তাদের মেশাইয়া!

জেরুসালেমে গমন ও মৃত্যু :—নানা স্থানে প্রচার ক'রতে ক'রতে যীশু শিষ্যদের নিয়ে সর্বশেষে উপস্থিত হ'লেন জেরুসালেমে। তাঁকে দেখবার জন্য লোক ভেঙ্গে প'ড়ল। সেখানে ইহুদীদের একটি মন্দির ছিল। মন্দিরের সামনে ধর্মের নামে নানারকম ব্যবসা চ'লত। যীশুর শিষ্যেরা ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ভেঙ্গে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। এতে ধনী ব্যবসায়ী আর পাণ্ডা-পুরোহিতরা ক্ষেপে উঠল। তারা ফন্দী আঁটতে লাগল কিভাবে যীশুর প্রাণনাশ করা যায়। সে সুযোগও মিলে গেল। যীশুর বার জন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল জুডাস্। এই জুডাস্ অর্থের লোভে একদিন যীশুকে পুরোহিতদের কাছে ধরিয়ে দিল। তারা যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে রোমান শাসনকর্তার নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত ক'রল। তারা মিথ্যা অভিযোগ করে ব'লল—এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী, কারণ এ নিজেকে ইহুদীদের রাজা ব'লে প্রচার ক'রছে।

শাসনকর্তা বুঝতে পারলেন যে, যীশু নির্দোষ। কিন্তু পুরোহিতদের কথা না রাখলে অশান্তি বাধবে। কাজেই তাদের কথায় তিনি যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। রোমান সৈন্যেরা যীশুকে জেরুসালেমের বাহিরে নিয়ে গেল এবং একটা কাঠের ক্রুশের গায়ে তাঁর হাত-পায়ে পেরেক ঠুকে তাঁকে হত্যা ক'রল।

খ্রীষ্ট ধর্মের বিস্তার ঃ—যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ দিকে দিকে তাঁর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। এই প্রচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **সেণ্ট পল**। তিনি এশিয়া মাইনর, গ্রীশ ও রোমে খ্রীস্টধর্মের প্রচার করেন। প্রথমে রোমান সম্রাটরা এতে বাধা দেন নি, কিন্তু ক্রমে তাঁরা খ্রীষ্টানদের উপর আরম্ভ ক'রলেন নিদারুণ অত্যাচার। প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে চ'লল নির্যাতন। বহু খৃষ্টানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হ'ল, কিন্তু খ্রীস্ট-ধর্ম মরল না। বরং শহীদদের হাসিমুখে ম'রতে দেখে খ্রীস্ট-ধর্মের প্রতি লোকে আরো বেশী আকৃষ্ট হ'ল। সমাজের নীচের তলার লোক—যারা নিঃস্ব ও নিপীড়িত, তারা এই ধর্মের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেল। কাজেই শত নির্যাতন সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বেড়েই চ'লল। অবশেষে সম্রাট্ কন্স্টাণ্টাইন নিজে খ্রীস্ট-ধর্ম গ্রহণ ক'রলেন। এর পর বিনা বাধায় খ্রীস্ট-ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়ল। নেজারেথের শিশুরই হ'ল জয়।

অনুশীলনী

১। যীশুকে খ্রীস্ট বলা হয় কেন? তাঁর শিক্ষার মূল কথা কি? এ বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে যীশুর কোন মিল আছে বলে মনে হয় কি?

২। ইহুদী পাণ্ডা-পুরোহিত ও সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা যীশুর শত্রু হয়েছিলেন কেন?

৩। খ্রীস্টানদের উপর রোমানদের অত্যাচার ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
গুপ্ত সাম্রাজ্য ও ভারতের স্বর্ণযুগ

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা :—খ্রীস্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন হয়। এ সময় থেকে প্রায় একশ' বছর ধ'রে ভারতে চ'লেছিল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। অবশেষে খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মগধে আবার এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজবংশই গুপ্তবংশ নামে খ্যাত। মোটামুটি ৩০০ থেকে ৫০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দুই শত বৎসর এই বংশ রাজত্ব করে। ভারতের এটি একটি গৌরবময় যুগ।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত :—চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন এই বংশের তৃতীয় রাজা। তাঁর সময়েই এই বংশের গৌরবের সূচনা হয়। তিনি মগধ থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার ক'রে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। বোধ হয় ৩২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। এই বৎসর থেকে গুপ্ত সম্বৎ বা গুপ্ত অব্দের আরম্ভ হয়। তখন কন্স্টা-ণ্টাইন রোমের সম্রাট।

সমুদ্রগুপ্ত :—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন ভারত-ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। মিশরের ফারাও ২য় থুটমোস আর বাবিলনের সম্রাট হামুরাবির মত তিনিও ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। এজন্য তাঁকে বলা হ'য়েছে 'ভারতের নেপোলিয়ান'।' তিনিই ছিলেন গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দিগ্বিজয়-কাহিনী

এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভের গায়ে খোদিত আছে। তাঁহার সভা-কবি হরিষেণ এই প্রশস্তি রচনা করেন। এই লিপি থেকেই আমরা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয় ও চরিত্রের কথা জানিতে পারি। প্রাচীন

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

পাটলিপুত্র তখনও রাজধানী ছিল। প্রথমে সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তে একাধিপত্য স্থাপন করেন। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হ'লেন। সেখানে রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা মাত্র তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।এভাবে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হ'ল। এই সীমানার বাইরেরও অনেক রাজ্য তাঁকে অধিরাজ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল।

গুপ্ত রাজারা হিন্দু ছিলেন। তাঁদের উপাস্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু। দিগ্বিজয় শেষ করে সমুদ্রগুপ্ত মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে তিনি বিশেষ এক শ্রেণীর স্বর্ণ-মুদ্রা বের করেন। তাঁর এক পিঠে যজ্ঞের ঘোড়া আর অন্য পিঠে রাণী দত্তাদেবীর মূর্তি র'য়েছে।

সমুদ্রগুপ্তের মত প্রতিভাশালী সম্রাট খুব কম দেখা যায়। তিনি শুধু বড় যোদ্ধা ছিলেন না। কবি হরিষেণ তাঁর উদারতা, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, কবিত্ব ও সঙ্গীতানুরাগের উচ্চ প্রশংসা ক'রেছেন। কবি হরিষেণ ছাড়া আরো অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁর সভা অলঙ্কৃত

ক'রেছিলেন। এ থেকে বিদ্যার প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।
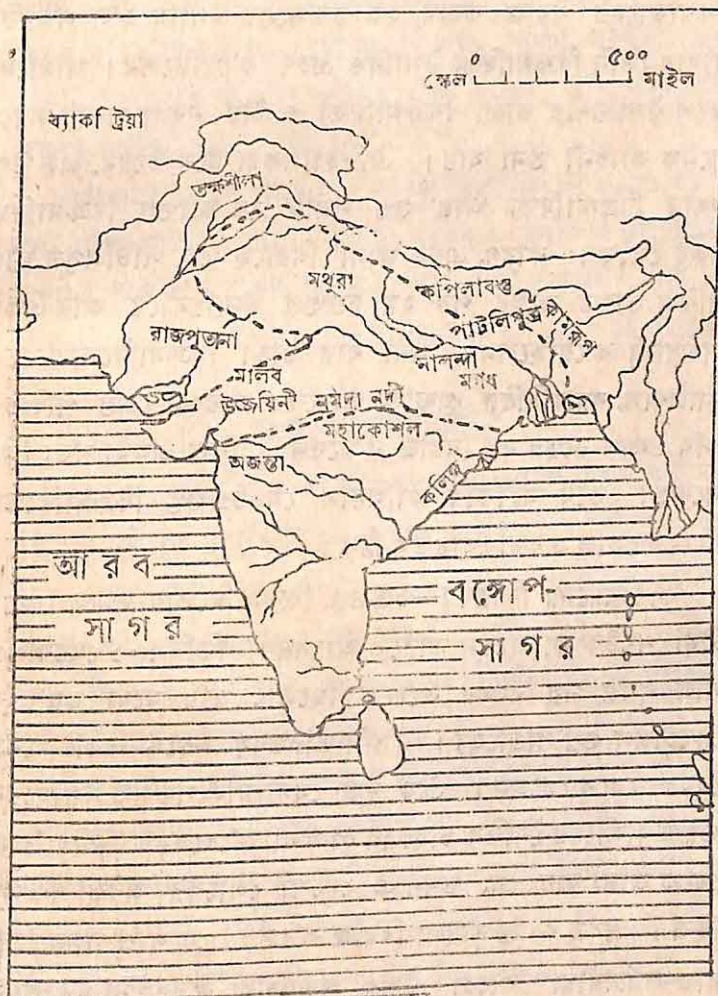
গুপ্ত সাম্রাজ্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ঃ—সমুদ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত। তিনিও পিতার মতই বীর, সুশাসক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি মালব, গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের শক্‌রাজ-

গণকে পরাস্ত ক'রে আরব সাগর পর্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করেন। পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলি ও **উজ্জয়িনী** তখন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁর শক্তি ও সমৃদ্ধি খুব বেড়ে গেল। শকরাজাদের পরাস্ত করায় ২য় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি হ'ল **শকারি**। আবার তিনি **বিক্রমাদিত্য** উপাধিও গ্রহণ ক'রেছিলেন। আমাদের দেশে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁর নবরত্ন-সভার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনা যায়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এই উপ-কথার বিক্রমাদিত্য আর গুপ্ত সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য একই লোক। কারণ, এখন জানা গিয়াছে যে, পাটলিপুত্র ছাড়া পশ্চিম ভারত জয়ের পর ২য় চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীতে আর একটা রাজধানী ক'রেছিলেন। শুনা যায় রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় **কালিদাস, বরাহমিহির** প্রভৃতি ভারতের বারজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি উজ্জল রত্নের মত বিরাজ ক'রতেন। কিন্তু একথা সত্য কিনা সন্দেহ। তবে মহাকবি কালিদাস যে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ের লোক একথা বোধ হয় ঠিক।

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে বিখ্যাত চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। তিনি ৪০১ থেকে ৪১০ সাল পর্যন্ত নয় বৎসর এদেশে ছিলেন, তার মধ্যে ছয় বৎসর কেটেছিল গুপ্ত-সাম্রাজ্যে। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের মত ফা-হিয়েনও ভারতবাসীদের নৈতিক চরিত্রের প্রশংসা ক'রেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখন এ দেশের লোকের অবস্থা খুব সমৃদ্ধ ছিল। সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ ক'রত। দেশে সুশাসন ছিল। রাজ-কর্মচারীরা কারো উপর অত্যাচার ক'রত না। প্রজারা নিরুদ্বেগে দিন কাটাত। রাজস্বের হারও কম ছিল। অপরাধীকে যথাসম্ভব লঘু শাস্তি দেওয়া হ'ত। দেশে চোর ডাকাতের ভয় ছিল

না। রাজ্যের সর্বত্র বিশ্রামাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। মগধের হাসপাতাল দেখে ফা-হিয়েন বিস্মিত হয়েছিলেন।

বঙ্গদেশ ঃ—তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সেকালের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ফা-হিয়েন এখানে দু'বছর কাটিয়েছিলেন। এখান থেকে বণিকগণ বড় বড় জাহাজে সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দূর দেশে বাণিজ্য ক'রতে যেত। এই বাণিজ্যের প্রসাদে দেশের সমৃদ্ধির তুলনা ছিল না।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঃ—চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য বোধ হয় ৪১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৮ বছর রাজত্ব করেন। তারপর **কুমারগুপ্ত** ও **স্কন্দগুপ্ত** সগৌরবে রাজত্ব করেন। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে বর্বর হুণ জাতির আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায়।

গুপ্ত আমলের স্বর্ণযুগ

খ্রীঃ ৩০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত সময়কে গুপ্তযুগ বলে ধরা যায়। এযুগকে গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগ ও রোমের অগাস্টাসের যুগের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বাস্তবিক ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের এমন গৌরবময় যুগ সম্ভবতঃ আর হয় নি। সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, ধর্মে—সকল ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি হ'য়েছিল। তাই এ যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

হিন্দু ধর্মের উন্নতি ঃ—গুপ্তযুগে হিন্দু ধর্মের চরম উন্নতি হয়েছিল। কুষাণ যুগে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হ'য়েছিল। কিন্তু ভারতের ভিতরে হিন্দু ধর্ম লোপ পায় নি—বরং ধীরে ধীরে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগে দেখা যায়, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। গুপ্তসম্রাটরা সকলেই ছিলেন হিন্দু। হিন্দুধর্মই তখন রাজ-ধর্ম হ'য়েছে, সুতরাং স্বভাবতই হিন্দু ধর্ম তখন প্রবল। গুপ্তযুগে লোকে শিব প্রভৃতি

দেবতার উপাসনা ক'রত। এ যুগে হিন্দু ধর্মে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের স্থান অধিকার ক'রেছিল **ভক্তিবাদ**। দেবতার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা এ সময় জনসাধারণের চিত্ত অধিকার ক'রেছিল। আর ভগবৎপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল জনহিতের আকাঙ্ক্ষা ও দানশীলতা।

ধর্মের উদারতা ঃ—বৌদ্ধধর্মও তখন জীবন্ত ছিল। ফা-হিয়েন এ দেশে বহু বৌদ্ধ মঠ দেখেছিলেন ; তাতে হাজার হাজার শ্রমণ বাস ক'রত। মথুরাতেই তিনি কুড়িটি মঠ দেখেছিলেন। পাটলিপুত্রে দু'টি মঠ ছিল; কিন্তু তখন দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। বিভিন্ন **সম্প্রদায়ের** মধ্যে যথেষ্ট উদারতা ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ যুগে সংস্কৃতের চর্চা বেড়ে গিয়েছিল। পুস্তকাদি আর পালি ভাষায় লেখা হ'ত না। ফলে এ যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের যেমন উন্নতি হ'য়েছিল, মহাকাব্যের যুগের পর তেমনটি আর কখনো হয় নি। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথমেই নাম ক'রতে হয় মহাকবি **কালিদাসের**। তিনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার উজ্জ্বলতম রত্ন। তাঁর মত কবি সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই। তাঁর চারিটি কাব্য ও তিনখানি নাটক পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে **মেঘদূত** কাব্য আর **শকুন্তলা** নাটক বিশ্ববিখ্যাত।

মেঘদূত কালিদাসের অমর কাব্য। মেঘকে দূত কল্পনা ক'রে বিন্ধ্য-পর্বত থেকে হিমালয় পর্যন্ত তার যাত্রাপথের এক অপূর্ব বর্ণনা আছে এই কাব্যখানিতে। পড়তে পড়তে পাহাড়-নদী, বন-জঙ্গল, নগর-প্রাসাদ, নর-নারী—এরা সবাই যেন চোখের সামনে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠে। আর কোন সাহিত্যে এর তুলনা মেলে না।

শকুন্তলা নাটকের নায়ক রাজা দুষ্মন্ত, আর কণ্ব-মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলা হ'লেন নায়িকা। মৃগয়ায় গিয়ে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে

বিয়ে করেন। তারপর ঘটনাক্রমে তিনি শকুন্তলার কথা ভুলে যান। তাতে শকুন্তলার আর দুঃখের অবধি থাকে না। শেষে দু'জনের মিলন হয়। তাঁদের একটি ছেলে হয়, তার নাম ভরত।

এ যুগের আরো দু'খানা বিখ্যাত নাটক হ'ল শূদ্রকের রচিত **'মৃচ্ছকটিক'** (মাটির খেলনা গাড়ী) আর বিশাখাদত্তের **'মুদ্রারাক্ষস'** (রাক্ষসের মুদ্রা)। মৃচ্ছকটিকের প্রধান নায়ক উজ্জয়িনীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ বণিক চারুদত্ত আর নায়িকা হ'লেন বসন্তসেনা। একখানা গাড়ীর বিভ্রাটকে ঘিরে নাটকখানি গ'ড়ে উঠেছে। মুদ্রারাক্ষস নাটকের গল্পাংশ কতকটা ঐতিহাসিক। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজাকে হত্যা ক'রে রাজধানী পাটলিপুত্র অধিকার ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত শত্রু হ'লেন নন্দরাজের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষস। রাক্ষস **নন্দবংশকেই** আবার সিংহাসনে বসাতে চান। তখন চাণক্য আর রাক্ষসের মধ্যে চলে কূটবুদ্ধির লড়াই। অবশেষে চাণক্যেরই জয় হয়। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন ; চাণক্য অবসর নেন।

আমাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের স্মৃতি-শাস্ত্রগুলি। এগুলি আমাদের জীবনকে নানা বিধিনিয়মে বেঁধে দিয়েছে। **মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্কস্মৃতি** প্রভৃতি স্মৃতি-গ্রন্থ এবং **পুরাণ**-গুলি এ যুগেই সঙ্কলিত হয়। **রামায়ণ** ও **মহাভারত** মহাকাব্য দু'টিও এ যুগেই বর্তমান রূপ ধারণ করে।

শিল্প :—সাহিত্য ছাড়া শিল্পেও এযুগে অসাধারণ উন্নতি হ'য়েছিল। গুপ্তযুগের শিল্পীরা কি মূর্তি-গড়া, কি চিত্র-আঁকা, কি মন্দির-গড়া, সব বিষয়েই আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। গুপ্তশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'ল এ যুগের দেব-দেবীর মূর্তিগুলি। আগের যুগের গান্ধারশিল্প এর কাছে দাঁড়াতে পারে না। সারনাথের মাটির নীচে বুদ্ধের অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তার মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্তিকে সারা ভারতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া মথুরা প্রভৃতি

স্থানেও অনেক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এযুগে ধাতু-শিল্পেরও চরম উন্নতি হ'য়েছিল। এ যুগের তৈরী দিল্লীতে যে লৌহ-স্তম্ভটি আছে, তাও এক বিস্ময়ের বস্তু। দেড় হাজার বছর আগে তৈরী হলেও আজ পর্যন্ত এর গায়ে একটু মরচে ধরেনি।

অজন্তার গুহাচিত্র (গোপা রাহুল)

আর সমগ্র জগতের বিস্ময়ের বস্তু হ'ল এযুগের **অজন্তা গুহার চিত্র**। অজন্তা বর্তমান হায়দরা-বাদ রাজ্যের অন্তর্গত। পাহাড় কেটে অজন্তার গুহাগুলি নির্মিত হয়। এখানে মোট ২৯টি গুহা আছে। তার মধ্যে চারিটি হ'ল **চৈত** বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপাসনাগৃহ, পঁচিশটি হ'ল **বিহার** অর্থাৎ ভিক্ষুদের বাসগৃহ। এদের মধ্যে ১৬টি গুহার প্রাচীরের গায়ে ও ছাদের নীচে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকা ছিল। এগুলির অধিকাংশই নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে; কিন্তু এখনও যা আছে তাও অপূর্ব।

চিত্রগুলির অধিকাংশ হ'ল গুপ্তযুগের। নানারকম সুন্দর সুন্দর নক্সাচিত্র ছাড়া বুদ্ধ ও বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর কত চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। বর্ণে, রেখায় ও ভাবে এগুলি এমন অপূর্ব যে দেশী ও বিদেশী গুণীরা শত মুখে এদের প্রশংসা করেছেন। মরণোন্মুখ

রাজকুমারী, মা ও ছেলে, দিব্যজ্ঞান লাভের পর স্ত্রী-পুত্রের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ প্রভৃতি চিত্র বিখ্যাত হয়ে আছে।

বিজ্ঞান ঃ—গুপ্তযুগে বিজ্ঞানও এদেশে আশ্চর্য উন্নতি-লাভ ক'রেছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ **আর্যভট্ট, বরাহ মিহির** এ যুগের গৌরব। আর্যভট্ট ছিলেন রাজধানী পাটলিপুত্রের অধিবাসী। তিনি 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে যে দিন-রাত্রি হয়, এ তত্ত্ব তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। বরাহমিহির ছিলেন উজ্জয়িনীর অধিবাসী। তাঁহার রচিত 'বৃহৎসংহিতা' জ্যোতিষের অমূল্য গ্রন্থ। গণিতশাস্ত্রেও এঁদের ছিল অসামান্য অধিকার। এর বহু আগে থেকেই গ্রীক ও রোমান জগতের সঙ্গে ভারতের ভাবের আদান-প্রদান চ'লছিল। ফলে ভারতের বিজ্ঞানীরা গ্রীক ও রোমান জ্যোতির্বিদ্যা থেকে কিছু গ্রহণ ক'রেছিলেন। সে যুগে হিন্দুরা অঙ্ক ও জ্যোতিষশাস্ত্রে যেমন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, চিকিৎসাশাস্ত্রেও কম প্রতিভার পরিচয় দেননি। চরক ও সুশ্রুতের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। সুশ্রুতে অস্ত্রোপচারের কথাও আছে। সেকালে বৈদ্যরা অস্ত্র-চিকিৎসায় ওস্তাদ ছিলেন; এমন কি তাঁরা শব-ব্যবচ্ছেদও করতেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে হিন্দুরাই গ্রীক্ ও আরবদের শিক্ষক। হিন্দুরাই এই বিজ্ঞানের জন্মদাতা। আলেকজাণ্ডার তাঁর শিবিরে হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত ক'রেছিলেন। খ্রীঃ পূঃ, ৮ম শতাব্দীতে আরবদের খলিফারা অনেক হিন্দু বৈজ্ঞানিককে বাগ্দাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সঙ্গে ক'রে জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে যান। সেগুলি আরবীতে অনুবাদ করা হয়। আরবদের কাছ থেকে এসকল বিদ্যা আবার ইউরোপীয়রা গ্রহণ করে।

সে ছিল ভারতের এক গৌরবের দিন। সে গৌরব আবার ফিরিয়ে আনাই হোক তোমাদের সংকল্প। স্মরণ কর কবির সেই উদাত্ত আহ্বান—

বল বল বল সবে,
শত বেণু-বীণা রবে,
ভারত আবার, জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে,
কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার
পুরাতন এ পূরবে॥

অনুশীলনী

১। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? তাঁর দিগ্বিজয়ের কথা সংক্ষেপে বল।

২। বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন সভা' সম্বন্ধে কি জান?

৩। ফা-হিয়েন কোন্ রাজার সময়ে ভারতে এসেছিলেন? তাঁর বিবরণ হইতে আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

৪। হূণ কাদের বলে? কি ভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান হয়?

৫। 'স্বর্ণযুগ' বলতে কি বুঝায়? গুপ্ত আমলকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলে কেন?

৬। গুপ্তযুগের কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের নাম কর। তারা কি জন্য বিখ্যাত বল।

৭। এগুলি সম্বন্ধে কি জান?—অজন্তা, শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস, আর্যভট্ট, হরিষেণ, তাম্রলিপ্ত, কালিদাস ও বরাহমিহির।

সময়-সূচক নক্সা

সময়		ভারতবর্ষ	রোম		চীন
খৃঃ পূঃ ২০০	ভারতে বৈদেশিক শাসন			হান্ রাজ বংশ — বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার	মধ্য এশিয়ায় চীন অধিকার বিস্তার
,, ১০০			জুলিয়াস সীজার অগাস্টাস (ভারতীয় দূত)		
খৃষ্টাব্দ ০		পহলবরাজ গুদুফের ? মহারাজ কনিষ্ক	যীশুখৃষ্টের জন্ম		চীন সম্রাট মিঙ্-টির বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ (খৃঃ ৬৭)
,, ১০০		মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন্	মার্কাস অরেলিয়াস্		
,, ২০০		অন্ধকার যুগ		রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা	
,, ৩০০	গুপ্ত সাম্রাজ্য	সমুদ্রগুপ্ত	সম্রাট কনষ্টান্টাইন		
,, ৪০০		চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য হূণ আক্রমণ	রোমে হূণ আক্রমণ রোমের পতন (৪৭৬)		ফা-হিয়েনের ভারতে আগমন
,, ৫০০					